দেবদাস

সম্প্রতি আমার প্রিয়ার বিয়ে হয়েছে। বলতে গেলে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছি তাকে। কারণ আমার করার কিছুই নেই। আমার পেশা মূলত ঠিকাদারি ব্যবসা। নিজের ইচ্ছায় হয়নি, উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া।

দেড় বছর বয়সে মা মারা যাবার পর বাবা একাধিক বিয়ে করেন। সংসারে শুধু দাদির কারণে কোনো কিছুর অভাব বুঝতে পারিনি। তা না হলে সৎ মায়েদের অত্যাচারে পাগল হয়ে যেতাম।

আমি বাবার একমাত্র ছেলে। তাই বাবা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। কোনো কিছুর জন্য না বলতেন না।

যেখানে থাকি সেই একই গ্রামে আমার এক বন্ধু যাকে আপন ভাইয়ের মতো দেখতাম সে সুবাদে ওদের বাসায় মাঝে মধ্যে যাওয়া হতো। তার একটা ছোট বোন ছিল। চেহারা কালো নয় আবার ফর্শাও নয়। কিন্তু আমার চোখে সে ড্রিম গার্ল। সে আমাকে মনে মনে অনেক আগে থেকেই ভালোবাসতো। আমি জানতাম না।

২০০২-এর ১৪ ফেব্রুয়ারিতে সন্ধ্যার পর ওদের বাড়িতে যাই। অন্যান্য দিনের মতো এবারও তাদের কাছে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে একটু বসে গল্প করে চলে যাবো ভেবে বের হচ্ছি। ঠিক সেই সময় আমার সামনে একটা লাল গোলাপ ধরে বললো, *এটা আপনার জন্য।* ফুলের সঙ্গে একটি চিরকুট দিয়েই দৌড়।

বাড়ি এসে চিরকুট খুলে পড়লাম। তাতে লেখা, আমাকে ভালোবাসো কি না তিন দিনের ভেতর জানাবে।

মনে মনে হাসলাম। কিন্তু ওই মনে মনে হাসি আজ কান্নায় রূপ নেবে কল্পনাও করিনি। সেদিনই জানিয়ে দিলাম আমার *না সূচক* শব্দটি। মূলত মেয়েটিকে পছন্দ করতাম না। কারণ আমি ছিলাম সুন্দরের পূজারি। গ্রামের ভেতর ফার্স্ট বয় ছিলাম।

কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, আস্তে আস্তে তার প্রতি দুর্বল হতে থাকলাম। রাতে শুয়ে ভাবতে থাকি, এই মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে বাড়ির কেউ রাজি হবে না। বিশেষ করে ছোট ফুপু, বড় ফুপু এবং বাবা। তারাই আমার প্রধান অভিভাবক।

বাবার কথা না হয় বাদ দিলাম। ফুপুদের কথায় বাবা ওঠেন-বসেন। সেখানে আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ অবান্তর। মনে সাহস সঞ্চার করে বাবাকে সব খুলে বললাম।

বাবা আমার কথায় রাজি হলেন। কেবল হলেন না আমার ফুপুরা।

মেয়েপক্ষকে বাবা বলে দিলেন, দুই বছর পর বিয়ে হবে। কারণ আমাদের বাড়ির কাজ চলছিল। তাছাড়া বড় ফুপুর বড় ছেলে দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকে। সে আসবে ,তারপর বিয়ে।

এরপর তাদের বাসায় যাতায়াত আরো বেড়ে গেল। দেখা হতো, কথা হতো না। খুবই রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে।

২০০৩ সালের ভ্যালেনটাইনস ডে-তে এক তোড়া ফুল দিয়ে তাকে বললাম, তিন দিনের মধ্যে আমাকে জানাবে, আমাকে বিয়ে করবে কি না।

লজ্জায় মাথা নিচু করে বললো, আমার অন্ধকার জীবনকে আলোকিত করেছো, এ আলো যেন নিভিয়ে দিও না।

বললাম, আমার ভালোবাসা তোমাকে আলোকিত করেছে। আমি তোমার কাছে পরাজিত।

কিন্তু পূর্ণিমার চাদ যে এক রাতের বেশি থাকে না তা বুঝতে পারিনি। নভেম্বর ২০০৩-এ আমার বাবা উচ্চ রক্তচাপের কারণে পরলোক গমন করলেন।

সাত আট মাস পরে যখন শোক সামলিয়ে উঠে দাড়ালাম তখন ফুপুরা বললেন, এই মেয়েকে বিয়ে করলে তুমি আমাদের পাবে না। তোমার রাস্তা তুমি দেখতে পারো।

এখন কি করবো? যাদের ছেড়ে থাকতে পারবো না আর আমর ভালোবাসা ছাড়া বাচতে পারবো না, সেখানে কি করতে পারি!

ফুপুরা অনেক বুঝিয়ে বললেন, ওর থেকে তোকে অনেক ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে দেবো। তুই আমাদের কথা শোন।

বললাম, সম্ভব নয়।

এদিকে উপায় না দেখে মেয়েপক্ষকে সব খুলে বললাম।

তারা বললো, আমরা কোনো অভিভাবক ছাড়া তোমার হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারি না।

আগেই বলেছি, রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, তাই সে পালিয়ে যেতেও চায়নি।

বলেছে, দেখো, সমাজ বলতে একটা কথা আছে। তুমি পুরুষ মানুষ, আমি মেয়ে। সম্মান গেলে মেয়েদের পরিবারের আগে যাবে, ছেলেদের নয়।

তার মুখে এসব শুনে তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাতে মোটেও কর্ণপাত করেনি। ঘটনা, মুহূর্ত, সময় সব পলকের মতো অতীত হয়ে গেল।

আমার জীবন এখন কঠিন সংকটময় পরিস্থিতির দ্বারপ্রান্তে। বেছে নিয়েছি জীবন ধ্বংসকারী ড্রাগস।

আজ এই গলিতে, কাল ওই গলিতে জীবন্ত লাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেবদাস হতে চাইনি। তাই তো হয়েছি!

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

বাগেরহাট থেকে

সেভ এ থট ফর মি এভরিডে

শাকিল,

এ কেমন প্রেম তোমার? একেই কি বলে রাহুর প্রেম? নিষ্ঠুরভাবে গ্রাস করেই যে তৃপ্ত হয়? কি ছিল আমার অপরাধ? আমার হৃদয়ে তুষের আগুনের জন্ম দিলে যা কেবল লোক চোখের আড়ালে ধিকি ধিকি জ্বলছে আজও? সবটাই কি ছিল তোমার ছলনা? ভালোবাসার কি নির্মম প্রতিদান তুমি দিলে! তুমিই তো লিখেছিলে, ভালোবাসা তো কোনো পাপ নয়, আমাদের মাঝে এই ভালোবাসার সেতুটুকু কেড়ে নিও না, এটাই মিনতি। তোমার দেয়া নোট বইটি হাতে নিয়ে আজও উন্মনা হই। পরম যত্নে লেখা তোমার সেই বাক্যটি পড়ে আজও বুক চিড়ে এক দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে।

Dearest Shanta
Save a thought for me everyday with love.
Yours Shakil.

কি এর অর্থ? প্রকৃতই কি আমার প্রতিদিনকার চেতনায় জাগ্রত থাকার আকুতি ছিল তোমার? কিসের দাবিতে ভালোবাসার? আমাকে নিঃস্ব করে প্রতিদানে কি তুমি দিয়েছো শুধু আর্তনাদ ছাড়া? ধূমকেতুর মতো আমার অন্ধকার জীবনে উদয় হয়ে খানিক আলো ছড়িয়ে আবার যখন অকস্মাৎ হারিয়ে গেলে চিরতরে তখন থেকে আমার হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ শুরু হলো, আজ দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরও যেন তার রেশ রয়ে গেছে। মন-প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবাসার প্রতিদানে বুক ভরা হাহাকার আর আত্মধিক্কারই আমার সম্বল। তোমাকে মন থেকে সম্পূর্ণভাবে উপড়ে ফেলার চেষ্টাতেও ব্যর্থ হই। এ আমার কেমন পরাজয়? মাঝে মধ্যে ভাবতে চাই সবটাই আমার মন গড়া অথবা দিবা স্বপ্ন। কিন্তু তোমার স্মৃতিগুলো তা হতে দেয় না।

আমার জীবনে তোমার আবির্ভাব দুবার।

প্রথমবার সেই ছাত্র অবস্থায় যখন বিশেষ কারণে তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। সেই ক্ষণে তোমার আয়ত চোখ দুটির করুণ দৃষ্টি আমার মনে দাগ কেটেছিল। যথাসময়ে ডাক্তার হয়ে তুমি প্রবাসী জীবন বেছে নিলে। আর কখনোই আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখোনি। তারপর?

দীর্ঘ ষোল বছর পর দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু। তখন বিদেশের মাটিতে স্বল্পকালীন এক ট্রেনিং শেষে দেশে ফেরার প্রস্তুতি চলছে। দৈবভাবে যেন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হলো বান্ধবী রুবীর মাধ্যমে। আহ্বান জানালে *শান্তা, তোমার জন্য আমি এক গোছা গোলাপ নিয়ে অপেক্ষা করবো, তুমি আসবে তো আমার সঙ্গে দেখা করতে?*

পারিবারিক পর্যায়ে বিধ্বস্ত হবার কারণে মনটা ছিল দুর্বল। তাই তোমার সেই উদাত্ত আহ্বানে ছুটে গিয়েছিলাম। তোমার উষ্ণ সান্নিধ্যে ও আবেগ আপ্লুত আবেশে কেটেছিল কয়েকদিন। পরম মমতায় ভরিয়ে দিয়েছিলে মন প্রাণ, তখন ভুলক্রমেও মনে হয়নি সবটাই *আলেয়ার আলো* যা ক্ষণিক পরেই মিলিয়ে যায়।

নতুন করে বাচার স্বপ্ন দেখিয়েছিলে, জীবনের অন্ধকারকে পেছনে ফেলে সোনালি সকালের আলোতে পথ চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। জানিয়েছিলে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে বিরোধ চলছে, অচিরেই সেখান থেকে মুক্ত হয়ে নতুন করে ঘর বাধবো আমরা। চিরদিনই ভাগ্য বিড়ম্বিতা বলেই হয়তো হঠাৎ শঙ্কা জেগেছিল মনে *এতো সুখ মোর সইবে কি?*

তোমাতে সম্পূর্ণভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে ফিরে এলাম নিজ ঠিকানায়। আশায় রইলাম পুনঃমিলনের। তোমার প্রেমময় চিঠিগুলো তাতে আরো ইন্ধন যোগাতো আর আচ্ছন্ন করে রাখতো দিন-রাত। কিন্তু মাত্র তিন মাস পরেই চিঠির সুর পাল্টালে। আমার জীবনের ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস বুঝে ওঠার আগেই এলো বজ্রাঘাতের মতো সেই শেষ চিঠি।

শান্তা,

আমার পরিবারের কাছে ফিরে যাচ্ছি। তাই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। এরপর যোগাযোগের কোনো চেষ্টা করো না। আমাকে ভুলে যেও

–শাকিল।

কতো সহজভাবে কথাগুলো লিখে নিজেকে গুটিয়ে নিলে। আর আমি? কতো বিনিদ্র রজনী আর অশ্রুর বন্যায় নিজেকে ভাসালাম, তুমি জানলেও না কোনোদিন। এতোগুলো বছর পার হবার পরও তুমি হৃদয় জুড়ে রয়েছো। আজও যে আমার অন্তরাত্মা তোমার জন্য গুমরে কাদে!

ইতি

তোমারই **শান্ত**

খিলগাও, ঢাকা থেকে

বুদ্ধু

– বুড়ি

যাকে ভালোবাসি তার নাম ধরি বুদ্ধু। বুদ্ধুকে কতোটা ভালোবাসি তা হয়তো আমার বুদ্ধু কখনোই বুঝবে না। কারণ আমার ভালোবাসা নাকি নীরব। সত্যিই আমার ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি না খুব সহজে, যতোটা আমার বুদ্ধু পারে। যতোটা ভালোবাসি তারচেয়ে কোটি কোটিগুণ বেশি ভালোবাসে বুদ্ধু আমাকে। ১২ জানুয়ারি আমাদের ভালোবাসার দুই বছর হয়েছে।

আমার বুদ্ধু আমাকে এতোটাই ভালোবাসে যে, আমি অবাধ্য হলে খুব কষ্ট পায়। অবশ্য ওর সঙ্গে সব সময় ঝগড়া করি। আমার বুদ্ধু চায় ওর সঙ্গে অনেক কথা বলি। কিন্তু ওর সামনে গেলে আমার কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। মনে হয় কে যেন আমার গলা ধরে আছে।

ও যখন কথা বলে, চুপচাপ মুগ্ধ হয়ে শুনি, কিছু বলতে পারি না। ওর কাছে যাবার আগে ভেবে রাখি কতো কিছু বলবো! সামনে গেলে সব কিছু গুবলেট পাকিয়ে ফেলি।

ওর সঙ্গে কম কথা বলি। তাই ও প্রচণ্ড কষ্ট পায়। আমি খুব ভীতু প্রকৃতির মেয়ে। আমার সাহস খুবই কম। বুদ্ধু আমাকে সাহস যোগায়, আমাকে সব কিছুতে উৎসাহ দেয়। অল্পতেই ভেঙে পড়ি। তখন আমার ভালোবাসা আমাকে বোঝায়।

আমার বুদ্ধুকে অনেক কিছু বলে ডাকি। চৈতির বাবা, ছাগল, জান, লক্ষ্মী।

আমার বুদ্ধু আমাকে বুড়ি বলে ডাকে।

আমার বুদ্ধুর কাছে গেলে মনে হয় বুদ্ধুর কোলে মাথা রাখি আর ও আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। বুদ্ধু অনেক ধৈর্যশীল ছেলে। ওকে প্রচণ্ড কষ্ট দিই। তারপরেও বুদ্ধু নীরবে সহ্য করে যায়। কষ্ট দেয়ার পর মনে হয় আমার বুদ্ধুর মতো ভালো মানুষকে কেন কষ্ট দিলাম! আমার বুদ্ধু আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করে।

আমাদের প্রথম কথা হয় ১২ জানুয়ারি। ১২ তারিখে দেখা হয় বলে দুজনে ঠিক করেছিলাম বারো দিন পর পর দেখা করবো। কিন্তু এখন আমাদের দুই দিন পর, এমনকি একদিন পরও দেখা হয়।

আমাকে দেখার জন্য কতো দূর থেকে ছুটে আসে।

ওর ধারণা, ওকে না দেখে হাজার বছরও থাকতে পারবো। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে, আমার জান অনেক দূর থেকে আসে। তাই ওকে যখন দেখতে ইচ্ছে করে, বলতে পারি না ওকে।

আমার বুদ্ধুকে নিয়ে রিকশা করে ঘুরি। মাঝে মধ্যে ভাবি, ও যখন আমাকে ওর ঘরে নেবে তখন সারা দিন এই মানুষটাকে প্রাণ ভরে দেখবো।

আমার ভালোবাসা আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। আমার বুদ্ধুকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করি। ঠিক মানুষ পেয়েছি সারা জীবনের জন্য। আল্লাহর কাছে সে জন্য শোকর আদায় করছি। বুদ্ধু আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। বুদ্ধুকে কখন যে, কষ্ট দিয়ে ফেলি জানি না নিজেই।

সারা পৃথিবীর মানুষ আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করলেও বুদ্ধু আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। আমি আর বুদ্ধু এখন এতোটাই কাছের যে, আমাদেরকে কেউ-ই আলাদা করতে পারবে না। আমি বুদ্ধু দৈহিকভাবে দুজন হলেও আত্মার দিক থেকে এক। যদিও ও মনে করে, ওর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আমার চিন্তা ভাবনার মিল নেই তবুও ওর সামান্য কিছু হলে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।

বুদ্ধু, তুমি কি বুঝতে পারছো, আমি কে? জানি তুমি পারবে।

বুদ্ধু, এটা মনে রেখো, তোমার বুড়ি শুধুই তোমার এবং শুধুই তোমাকে ভালোবাসে।

বুদ্ধু, ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা রইলো।

সবশেষে বলছি, আমার বুদ্ধুকে প্রচণ্ড ভালোবাসি।

ঠিকানা বিহীন

রাবু

- মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

সদ্য মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসেছি। ভাবছি কোনো চাকরিতে যোগদান না করা পর্যন্ত দিনগুলো বাড়িতে কাটাবো।

বেশ কয়েক বছর ইউনিভার্সিটিতে থাকাতে গ্রামের অনেকের সঙ্গে আগের মতো আর দেখা হয় না। ফলে চেনাজানা মানুষ দেখলেই সেখানে আলাপের পর আলাপ চলে। এমনি করে আমার গ্রামের এক চাচার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একদিন।

চাচা তো আমাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত। বলেই ফেললেন, শুনেছি, তুমি বাড়ি এসেছো। তোমার কাছে যেতাম দুই একদিনের মধ্যে।

বললাম, এ কেমন কথা। আপনি কাউকে দিয়ে সংবাদ পাঠালে তো আমিই আসতাম আপনার বাড়িতে। এখন সময় থাকলে বলতে পারেন। এই বলে তাকে নিয়ে একটি চায়ের দোকানে বসে পড়লাম।

চাচা বললেন, বিষয়টি আমার রাবুকে নিয়ে। ও তো এবার ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন টেস্ট দেবে। তুমি যদি ওকে একটু দেখিয়ে দিতে তাহলে ওর প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হতো।

তারপর আরো অনেক কথা হলো।

পরিশেষে বললাম, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি এখন ফ্রী আছি, সমস্যা হবে না।

চাচার মেয়ে রাবু । ও যখন জুনিয়র বৃত্তি পেয়েছিল তখন ওকে একবার দেখেছিলাম। এর মধ্যে আর দেখিনি। নিশ্চয়ই এতোদিনে বেশ বড় হয়েছে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে দুই দিন পর ওদের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। আমাকে দেখে চাচা ছুটে এলেন। রাবু, দেখ কে এসেছে! বলে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

আমি তো রাবুকে দেখে অবাক!

ও সম্ভবত বিকেলের ঘুম দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসেছে। মুখ বেয়ে পানি পড়ছে ঘাসের ডগার শিশিরের মতো। নাকের পাশে তিলটা তাকে আরো মোহনীয় করে তুলেছে।

আমাকে বসতে দিল।

রাবুও ফ্রেশ হয়ে আমার পাশে বসলো।

নতুন কোনো পরিচয় নয়, আগে থেকেই চেনা-জানা আছে। সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যে আলাপ জমে উঠলো।

এভাবে প্রায় দুই মাস হয়ে গেল। প্রতিদিনই গিয়ে তাকে একবার পড়ার বিষয়ে গাইড দিয়ে আসতাম।

ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষার তারিখ দিয়েছে।

রাবুর বাবা আমাকে বললেন, পরীক্ষার সময় তুমি ওর সঙ্গে যেও। যেহেতু তুমি ওখানকার ছাত্র ছিলে, তোমারই সব জানাশোনা আছে।

রাবু পাশের রুম থেকে আমাকে কি যেন ইশারা দিল।

আমি আর না করতে পারলাম না।

ভর্তি পরীক্ষা হবে দুই দিন। আগের দিন আমি এবং রাবু লাগেজ গুছিয়ে রওনা হলাম। কুষ্টিয়া শহরে থাকতে হবে। পাশেই ইউনিভার্সিটি। আগে থেকে মহিলা হলে রাখার জন্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু থাকার মতো সিট নেই।

কুষ্টিয়া পৌছালাম বিকেলের দিকে। *আজাদ আবাসিক হোটেল*-এ চলে গেলাম। ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললাম।

তিনি বললেন, সব রুম বুকড হয়ে গেছে। মহিলাদের জন্য কোনো সিংগল রুম নেই। ডাবল সিটের একটি রুম আছে।

উপায়ান্তর না দেখে বললাম, ওটাই দেন।

রাবু মুখটা নিচু করে কি যেন ভাবছে।

যাই হোক। রুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হলাম।

রাবুকে বললাম, বই নিয়ে পড়ো, আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

রাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। আপনি কোথাও যাবেন না। এর আমি কোনোদিন হোটেলে থাকিনি। বিশেষ করে এখানে একা থাকতে পারবো না। আপনি জার্নি করে এসেছেন, শুয়ে থাকুন, আমি টেবিলে পড়ছি।

কি আর করা! ও খুব রাগী। যদি আবার বেকে বসে! কারণ এর আগে দেখেছি, ওদের বাড়িতে যেতে যদি একটু দেরি হতো, ও আমার সঙ্গে কথা বলতো না। সুতরাং রুমে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

রুম একটাই। রাতে ঘুমানোর সময় ওকে বললাম, তুমি এখানে থাকো। আমি হোটেলের টিভি রুমে গিয়ে থাকছি।

রাবু বললো, ওখানে কি বেড আছে?

না।

তাহলে?

সারা রাত টিভি দেখে কাটাবো।

আমার জন্য এতো কষ্ট করবেন কেন? এই রুমে থাকার জন্য রাবু সরাসরি কিছু বলতে পারছে না। শুধু বললো, সারা রাত আমার ঘুম হবে না।

কেন?

আপনি জেগে থাকলে আমি ঘুমাবো কি করে!

তোমার আগামীকাল পরীক্ষা, রেস্ট প্রয়োজন।

রাত তখন বারোটা। এ কথাগুলো বলতে বলতে বেরিয়ে আসছি। রাবুর মুখে কষ্টের ছাপ। অব্যক্ত কথাগুলো যেন চোখ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

শুধু বললো, আজ রাত না ঘুমিয়ে যে কষ্ট পাবো, আপনাকে না দেখে থাকার যন্ত্রণা তারচেয়ে বেশি।

সকালে রেডি হয়ে ইউনিভার্সিটির দিকে যাত্রা করলাম। পরীক্ষা ওর ভালো হলো।

এভাবে দুই রাত কেটে গেল। পরীক্ষা শেষে ওকে বাড়িতে পৌছে দিলাম।

বললাম, আমার দায়িত্ব শেষ। আগামীকাল থেকে আর এখানে আসবো না।

রাবু রেগে গেল।

বললাম, মাঝে মধ্যে কি আর না এসে পারবো?

এভাবে বেশ কয়েক মাস যাওয়ার পর কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রে আমার একটি চাকরি হয়ে গেল। চলে গেলাম সেখানে। রাবুও চান্স পেয়েছে। ইংরেজিতে পড়বে। আমি থেকে ওকে ভর্তি করিয়ে হলে সিটের ব্যবস্থা করে দিলাম।

আমার মোবাইল নাম্বার ওর কাছে ছিল। কিন্তু ওর কোনো মোবাইল না থাকাতে বেশি একটা যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। বাড়িতে এলে মাঝে মধ্যে দেখা হতো।

হঠাৎ রাবু একদিন আমার মোবাইলে একটি মেসেজ পাঠালো, প্রেমের বিষয়ে আপনি কি ভাবেন।

অপরিচিত নাম্বার তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ওর কোনো উত্তর দিতে পারিনি। ভেবেছি দেখা হলে সব খুলে বলবো। কিন্তু যখনই ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছি তখনই দেখেছি রাবু ক্যাম্পাসে। আবার রাবু বাড়িতে এলে আমি থাকতাম কুয়াকাটা। সুতরাং কষ্টের পরিমাণ শুধু বাড়তেই লাগলো।

রাবুর পড়ালেখার চাপ। ও ঠিকমতো যোগাযোগ রাখে না।

আমারও সময় কম। সুতরাং দেখা হয় না অনেক দিন।

কিন্তু অল্প দিনের জন্য দুজন দুজনার যে কতো আপন হয়েছিলাম এটা ভাবলেই কষ্ট পাই। ক্ষণিকের তরে আমার সেই ছোট্ট অর্থাৎ মিনি ভালোবাসা আজও আমাকে রাবুর কাছে নিয়ে যায়। কুয়াকাটা সৈকতে দুজন ঘুরে বেড়াই। কিন্তু ওকে ছুতেই দেখি ঘুম ভেঙে গেছে। মিনি ভালোবাসা এখনো আমার স্বপ্নে দোলা লাগায়।

নওয়াপাড়া, যশোর থেকে

জলি ব্যবসা

ইটস মাচ ট্রাবল দ্যান ডুয়িং বিজনেস।

এই উক্তিটি আমাদের তাইওয়ানিজ এক বন্ধুর। নাম *টেরেসা*। এখানে *ইট* হচ্ছে *ভালোবাসা*।

অনেক দিন যাবৎ টেরেসার কোনো খবর না পেয়ে ই-মেইল করি গত নভেম্বরে এই ভেবে যে, আবার অসুস্থ হয়ে পড়লো কি না।

মাঝখানে ও ভীষণ অসুস্থ ছিল। শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক ধকল এ দুয়ে মিলে ও খুবই ডিপ্রেসড ছিল এবং ডাক্তার ওকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবসা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বলেছিল। তখন ও আমার স্বামীকে একটা ই-মেইল করে। আই'ম ভেরি সিক, কান্ট থিংক এনিথিং। জাস্ট লাইক এ বেবি। আই নো ইউ ডু মাচ হার্ড ওয়ার্ক। ইউ শুড টেক রেস্ট। ইউ'ল গেট বিজনেস এগেইন বাট নেভার গেট মোমেন্টস। সো এনজয় ইওর মোমেন্টস উইথ ইওর পৃটি ওয়াইফ অ্যান্ড লাভিং কিডস।

কিন্তু টেরেসা জানে না যে এখানে ভালোবেসে প্রায় সকলেই কবি এবং ব্যবসায় অনেকেরই ভরাডুবি। একবার গেলে আর আসে না।

আমার ই-মেইলের উত্তরে ও লিখলো, আই'ম রাইট নাও। ক্যান ইউ ইমাজিন আই'ম ইন লাভ উইথ এ ভেনিজুয়েলিয়ান চায়নিজ। হি কেইম হিয়ার টু বাই মেশিন ফ্রম আস। হি হ্যাজ এ প্লাস্টিক ব্যাগ মেকিং ফ্যাক্টরি ইন ভেনিজুয়েলা। বাট মাই ফাদার ডাজ নট অ্যাপৃশিয়েট বিকজ হি ডাজ নট ওয়ান্ট মাই মুভিং টু ভেনিজুয়েলা। আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট শুড আই ডু।

এখানে না বললেই নয় যে, আমার স্বামীর নামেই ই-মেইল করি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। সেগুলো ও সরাসরি ডিক্টেশন দেয় এবং ফ্যাক্টরি থেকে ফোনে ডিরেকশন দেয়। এগুলো হয় ছোট এবং টেকনিকাল। আমার স্বামীকে না জানিয়ে মাঝে মধ্যে সকলের ব্যক্তিগত খোজখবর নিই। বিভিন্ন উৎসবে ই-কার্ড পাঠাই আমার স্বামীর নামে। ফলে সকলের সংগেই আমার সুসম্পর্ক।

টেরেসা-র সঙ্গে আমার স্বামীর পরিচয় ১৯৯৮ সালে তাইওয়ানের ট্রেড ফেয়ার *তাইপে প্লাস*-এ ওদের কম্পানির স্টলে। অতঃপর মেশিন কেনার সুবাদে সম্পর্কের গড়িয়ে চলা।

টেরেসার সঙ্গে আমার পরিচয় ২০০১-এর জুলাই-এ। ও ঢাকার *হোটেল পূর্বানী*-তে উঠেছে।

সন্ধ্যাবেলা আমার স্বামীর সঙ্গে পূর্বানীতে গেলাম।

ওর রুমে নক করার পর দরজা খুলে মিষ্টি হেসে বললো, হাই, গুড ইভনিং। আমার দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকালো।

হ্যালো, গুড ইভনিং জানালাম।

মাই ওয়াইফ। আমার স্বামী পরিচয় করিয়ে দিল।

রিয়ালি! বিউটিফুল, কাম অন ইন বলে ভেতরে নিয়ে বসালো। ওয়ান মোমেন্ট প্লিজ, বলে ল্যাপটপ-এর কাজ গুটিয়ে আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ জুড়ে দিল। আমাকে বললো, আই নো অ্যাবাউট ইওর লাভ ম্যারেজ। হি টোল্ড মি। ইউ হ্যাভ এ বেবি।

নাও আই হ্যাভ টু। বললাম।

রিয়ালি! ইউ আর লুকিং টিন এজার। হাউ ইজ ইট পসিবল?

থ্যাংকস ফর ইওর কমপ্লিমেন্টস, ইটস পসিবল ইফ ইউ ওয়ান্ট। বললাম।

আমার স্বামী ব্যবসায়িক আলাপ জুড়ে দিল। কোথায় গিয়েছিল, কোনো মেশিন বিক্রি হয়েছে কি না, এসব।

ও জানালো যে, খুলনা গিয়েছিল। দে ওয়ান্ট চিপ রেটেড মেশিন বাট ইউ নো আওয়ার মেশিন ইজ নাম্বার ওয়ান। মোস্ট অফ দি পার্টস আর ফ্রম জার্মান অ্যান্ড জাপান। ইফ ইউ ওয়ান্ট কোয়ালিটি অ্যান্ড লংজিভিটি ইউ শুড নট বারগেইন উইথ প্রাইস। হোয়াট অ্যাবাউট ইওর বিজনেস?

মেয়েটি খুব মিষ্টি করে হাসে।

অবাক হয়ে দেখছি আর ভাবছি। আমার সমবয়সী অথবা ছোট এই অবিবাহিত মেয়েটি কিভাবে কতো দূরে ব্যবসায়িক কাজে একা এসেছে যা আমরা ভাবতেই পারি না। আরো অনেক কথার পর বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

এরপর আমার স্বামী বেশ কয়েকবার তাইওয়ান গিয়েছে। টেরেসাকে এবং অন্যান্য কম্পানির প্রতিনিধিদের কিছু উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছি।

যেমন – আড়ংয়ের সূচিকর্মের ফতুয়া, কার্ড ইত্যাদি।

আমার স্বামীর পছন্দের গিফট মুন্নু অথবা শাইনপুকুর–এর সিরামিক সামগ্রী।

ওরাও অনেক গিফট দেয়। যেমন আমার বাচ্চাদের জন্য পাইনএ্যাপেল পাই, ক্লিপ, খেলনা, ঘড়ি এবং আমার জন্য রাইস ওয়াইন ইত্যাদি।

নভেম্বরে টেরেসার ভালোবাসার সংবাদ পেয়ে আনন্দিত ও রোমাঞ্চিত হই। মেয়েটি দ্বিধান্বিত দেখে ভাবলাম কিছু উপদেশ দিই যদি ওর কাজে লাগে। আমি লিখি, ওয়াও! রোমান্টিক নিউজ নোডাউট। ইউ ক্যান মেক লাভ উইথ এনিবডি অফ এনিকান্ট্রি। কিন্তু যখন তুমি কাউকে বিয়ে করার এবং অন্য দেশে স্থায়ী হবার সিদ্ধান্ত নেবে তখন অবশ্যই কিছু ব্যাপারে যেমন তোমার বয়ফ্রেন্ডের জীবন–যাপন, আর্থিক অবস্থা, ওই দেশের আবহাওয়া, সর্বোপরি তোমার পেশা কিভাবে পরিচালিত করবে প্রভৃতি বিষয়ে যাচাই করে নেবে। যদিও তোমার ব্যক্তিগত বিষয় তবুও এসব কারণে অনেক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। আর তোমাদের দেখেছি যে, তোমরা পারিবারিক বন্ধনে বিশ্বাসী।

তোমার জীবন শুধুই তোমার। কাজেই তুমি যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারো। তবে তুমি বুদ্ধিমতী ও পরিপক্ক। তাই আশা করবো যে, তুমি এমন সীদ্ধান্ত নেবে যা তোমার জীবনকে পরিপূর্ণ করবে। তবে কিছুটা সময় নাও। কারণ প্রেমের প্রাথমিক পর্যায়ে সকলেই আবেগে পূর্ণ থাকে এবং সব পজিটিভ চিন্তা করে। কেননা ওই সময় সকলেই কিছুটা বোকা হয়ে যায়। ফলে ও সময়ের সিদ্ধান্তগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল হয়। টেক কেয়ার।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আমাকে লিখলো, আই'ম সো সো নাও। আমার বয়ফ্রেন্ড তাইওয়ানে সেটল–এর কথা ভাবছে। আমরা উভয়ই ভেবেছি যে, কিছু সময় নেবো। আমার বাবা খুবই বিস্মিত যে, তার সন্তানগুলো কেন দূরে চলে যায়। কেননা আমার বড় বোন ছয় বছর ধরে আমেরিকায়। এক ফ্রেঞ্চকে ভালোবেসে বিয়ে করার সীদ্ধান্ত নিয়েছে। পরের বোনটিও দেশের বাইরে। বাবা খুবই ব্যথিত। আমি তার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। তাই আমাকে দূরে যেতে দিতে চায় না। কাজেই আমার ওপর অনেক দায়িত্ব। ফলে মানসিক চাপও বেশি। আই ফিল ভেরি ওয়ার্ম দ্যাট ইউ গেইভ মি নিডফুল সাজেশন। বিকজ আই ওয়াজ রিয়ালি কনফিউজড। ইটস মাচ ট্রাবল দ্যান ডুয়িং বিজনেস।

ভূমিকম্পের পর তাইওয়ানের অনেকের সঙ্গে টেরেসারও ই–মেইল পেলাম।

সকলেই জানতে চেয়েছে আমরা সেইফ কি না।

সকলকে আশ্বস্ত করলাম ও ধন্যবাদ জানালাম।

৩১ ডিসেম্বর টেরেসার আবার ই–মেইল পেলাম। ও এখন ভেনিজুয়েলায় বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে রোমান্টিক সময় কাটাচ্ছে এবং খুব ভালো আছে। ২০ জানুয়ারি তাইওয়ান ফিরবে। আমার স্বামীকে আবারও উপদেশ দিল,

মনে রেখো, তোমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তোমার স্ত্রী এবং সন্তান, এমনকি তোমার ব্যবসার চেয়েও বেশি।

টেরেসাকে হয়তো কখনই বলবো না যে, আমাদের মতো ব্যবসায়ী যাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই এবং পূর্ব পুরুষের রেখে যাওয়া টাকা নেই তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যবসা। এমনকি স্ত্রী এবং সন্তানদের চেয়েও বেশি। কারণ এরা প্রতিনিয়ত হয়রানির স্বীকার হচ্ছে, এমনকি পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে। আমরা যদিও বা পুলিশের সাহায্য চাই, তখন রাজনৈতিক নেতাবৃন্দের দ্বারা চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে পুলিশও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। রাজনৈতিক নেতারা *কম্প্রোমাইজ* করতে বলেন।

পাওনা টাকা ফেরত পাবো এটাই ধ্রুব সত্য হওয়া উচিত। কারণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছি এবং সুদ দিচ্ছি। তবে কি ওই নেতারা *কম্প্রোমাইজ* শব্দটির মানে জানেন না? ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাটির জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। যাদের গায়ে স্বল্প পুজির এগারো হাত শাড়ি, তার থেকে কিছু অংশ কাটায় বিধে রয়ে গেলে গা ঢেকে রাখার মতো ব্যবসা চালানো কঠিন।

সম্মানিত অর্থমন্ত্রীর দেয়া সুবিধার ফসল ব্যবসায়ীরা ব্যাংকে সময় মতো ফেরত দিতে পারছে না প্রধানত ঘুসের কারণে এবং পাওনা টাকা ফেরত না পাওয়ার ফলে।

কাজেই ইন বাংলাদেশ ডুয়িং বিজনেস ইজ মোর ডিফিকাল্ট দ্যান ডুয়িং লাভ।

mahfuza@aitlbd.net

কোনটা ভুল

- মারুফ ঝিকু রানা

তখন ক্লাস এইটে পড়ি। ডিফেন্স–এ বাবার চাকরির সুবাদে প্রতি বছর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হয়। এবার আসতে হলো শ্রীমঙ্গল থানায়। আমরা সেখানের আর. কে. মিশন রোডস্থ একটি বাড়ির তৃতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে উঠি।

দিন যেতে যেতে যখন ক্লাস টেনে উঠি তখন বাবার আবার অন্যত্র বদলি হয়ে গেল। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, তিনি যাবেন। আমরা সেখানেই আরো তিন বছর থাকবো। অর্থাৎ আমার এইচএসসি পাস পাশ করা পর্যন্ত সেখানে থাকতে হবে।

এক সময় এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হলাম। কলেজ, সে যে কি মজা! মেয়েদের সঙ্গে ক্লাস করা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পগুজব, আড্ডা, মাঝে মধ্যে তাপমাত্রার ঊর্ধগতি ইত্যাদি।

এরই মধ্যে নিজেকে একটু বড় ভাবতে শিখেছি, নিজের মধ্যে এক অমলিন পরিবর্তন এসেছে।

কিছুদিন পর আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে একটা নতুন পরিবার এসেছে। গৃহকর্তা বাবার সঙ্গে একই র‌্যাংকে চাকরি করেন। তাই ওই পরিবারের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। তাদের কোনো ছেলে ছিল না। তিন মেয়ে যথাক্রমে ঝিকু, ঝাকু ও রিকু। বড়টির সঙ্গে আমার নামের একটু মিল থাকায় তাকে কেউ ডাকলে দুষ্টামি করে সাড়া দিতাম।

এরই মধ্যে ছোট যে রিকু তার সঙ্গে আমার অন্য রকম সম্পর্ক গড়ে উঠলো মনের অজান্তেই। সে তখন ক্লাস নাইনে পড়তো। যখন পড়ার টেবিলে বসতাম, সে ছাদে উঠে আমার দিকে চেয়ে থাকতো। প্রথম প্রথম লজ্জা পেতাম। পরে সয়ে গেল। আস্তে আস্তে তার সঙ্গে আরো ফৃ হয়ে গেলাম।

একদিন বিকেলে সে ছাদে ওঠার পর বাইরে থেকে ছাদের দরজা আটকে দিলাম।

ও তখন দরজার ওপর দিকে হাত বের করে খোলার জন্য ইশারা করতে লাগলো।

তার হাতে একটা কিস দিয়ে দরজা খুলে দৌড় দিলাম। কিন্তু পরে সে এ সম্পর্কে আর কিছু বলেনি।

অন্য একদিন রাতে আমার মা ও রিকুর মা এক জায়গায় বেড়াতে গেলেন।

আমি ও রিকু তাদেরকে নিচ পর্যন্ত দিয়ে ওঠে আসছিলাম। হঠাৎ রিকু দোতলা পর্যন্ত উঠে হাত প্রসারিত করে দাড়িয়ে গেল।

অবাক হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম সে আমার কাছে কিছু চাইছে। কিন্তু তাকে ছুতে পারলাম না। মনে এক অজানা ভয়, যদি আমার ভালোবাসার গায়ে একটু কালি পড়ে যায়!

আমাকে এভাবে নিশ্চুপ দেখে সে রাগ করে উপরে উঠে গেল।

এরপর একদিন ঈদের আগ মুহূর্তে তাকে ঈদ কার্ড দিলাম, সঙ্গে একটি চিঠিও।

ও আমার চিঠির কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু আগের মতো দুষ্টামি, বাকা চাহনি ও ভালোবাসার নির্বাক হাতছানি চালিয়ে যেতে লাগলো।

একদিন তারা এই ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্য ফ্ল্যাটে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যাওয়ার দিন ওর দিকে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু সে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছিল।

তখন তার ছলনা বুঝতে পারিনি। সেদিন সারা দিন আমার চোখ দিয়ে পানি ঝরেছিল।

পরদিন তাদের নতুন ফ্ল্যাটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি সে রিকশা করে আসছে। তাকে থামালাম। কথা বলতে গিয়ে দেখলাম তার কণ্ঠস্বর পাল্টে গেছে। এ এক নতুন রিকু।

তাকে দুটো ক্যাসেট দিতে চাইলে ওগুলো ফেলে দিল এবং আগের দেয়া একটি ক্যাসেট ফেরত দিল।

তার এই আচরণ দেখে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। নিজেকে খুব বোকা মনে হতে লাগলো। কেন যে ওই দিন সিড়িতে তাকে জড়িয়ে ধরলাম না। কেন বিচরণ করলাম না তার সমস্ত অঙ্গে।

বন্ধুরা সান্ত্বনা দিল। ভুলে যেতে বললো।

ভুলেও গেলাম। আসলে ভুলিনি। কেননা তাকে যে সত্যিই ভালোবাসতাম।

এরপর অনেক দিন কেটে গেল। মেয়েদের দিকে তেমন একটা তাকাই না, তেমন কথাও বলি না।

আমাদের ওই বাড়ির নিচের তলার ফ্ল্যাটে এক হিন্দু পরিবার এলো। তাদের এক মেয়ে আর ছোট্ট একটা ছেলে। নিচতলায় হওয়াতে প্রায়ই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো। কিন্তু কোনো কথা বলতাম না।

একদিন একেবারে চোখে চোখে চোখ পড়ে গেল। কোনো ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে চলে গেলাম।

অন্য একদিন তাদের জানালায় হাত রেখে পাশে পানির ট্যাংক বানাচ্ছিল তা দেখছিলাম।

মেয়ের বাবা-মা দুজনই চাকরি করতো, তাই কেউ বাসায় ছিল না। মেয়েটা আমাকে এসে বললো, জানালা থেকে হাত সরান।

আমার জেদ চেপে গেল। বললাম, না, সরাবো না।

সে আরো দুতিনবার বললো।

কিন্তু আমি সরালাম না।

হঠাৎ ও আমার আঙুলে জোরে এক কামড় বসিয়ে দিল। আবার সঙ্গে সঙ্গে ফৃজ থেকে বরফ এনে ঘষতে লাগলো।

শুধু চেয়ে রইলাম। এক সময় বললাম, আমি তোমাকে একটা কিস দেবো।

সে একটু ইনিয়ে বিনিয়ে রাজি হলো। দরজা খুললো।

সোফায় শুইয়ে তার ঠোটে ঠোট বসিয়ে ধরে রাখলাম পাচ মিনিট। তারপর উঠে এলাম।

এরপর থেকে প্রতিদিন চলতো আমাদের এই অতৃপ্ত যাত্রা। ওর বুকের দুটো এক করে চুষতাম, টিপতাম, নিচের দিকে যেতাম। আঙুল দিতাম। কিন্তু ওই কাজটি করতাম না। ভাবতাম সে হিন্দু, তার জীবনটা নষ্ট করবো।

সে কোনো কিছুতেই না করতো না।

একদিন বিকেলে সে বারান্দা ঝাড় দিচ্ছিল।

পেছন দিকে থেকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম যা প্রায়ই করতাম।

কিন্তু সে আমাকে ঝেড়ে ফেলে দিল। ও ঘরে চলে গেল।

বুঝতে পারলাম না কেন হঠাৎ ও এমন করলো।

তারপর থেকে আর কখনো তার সঙ্গে কথা হয়নি। এক সময় চলে এলাম। আর ভাবছি কোনটা ভুল? আগেরটা, না পরেরটা?

নোয়াখালী থেকে

অস্বীকৃত

- শাহরিয়ার শরীফ

বেশ কয়দিন আগে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটি ছিল আমার এবং আমার স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে লেখা। হ্যা, ইমু নামের একটি মেয়ে তার বিয়েতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের দুজনকে আসার জন্য অনুরোধ করেছে। যদিও ইমু নামটি আমি ইচ্ছা করে ব্যবহার করলাম।

চিঠি পেয়ে আমার স্ত্রী মহাখুশি। কিভাবে যাবে, কি গিফট দেবে, কয়দিন থাকবে ইত্যাদি প্ল্যানে আমাকে সারাক্ষণ বিরক্ত করে তুললো।

আমি শুধু ওর মুখ পানে তাকিয়ে এমন একটা ভাব প্রকাশ করলাম যাতে হ্যা এবং না দুটোই বোঝা যেতো। কিন্তু তাকে দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে যে জিনিসটি থেকে আড়ালে রেখেছি তা এই বিয়ের কার্ডটি মনে হয় সব ভণ্ডুল করে দেবে সেই চিন্তাই অস্থির। আমার স্ত্রীকে বোঝাতে পারছি না আমি ইমুর বিয়েতে যেতে পারবো না। যে কারণে যেতে পারবো না তা শুনলে সে সহ্য করতে পারবে না। আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। তাকে বোঝাতে পারছি না তোমাকে ভালোবাসি বলে আমি ওই বিয়েতে যেতে পারবো না।

যদিও আমার ভালোবাসা আজ দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে আমার স্ত্রী, অন্যদিকে ইমু। একজন বৈধ, অন্যজন অবৈধ। একজন বর্তমান, অন্যজন অতীত। সে ভোরের শিশিরের মতো ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তার প্রেম কেন আমাকে বার বার অতীতের দিকে টেনে নিয়ে যায় তা জানি না।

আজ থেকে প্রায় বছর দেড়েক আগে বেসরকারি চাকরি পেয়ে উত্তরবঙ্গের এক থানা শহরে গেলাম। ঢাকা থেকে সেখানে আসার পর তড়িঘড়ি করে একটা বাসা দেখলাম। ব্যাচেলর শুনে বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া দিতে অনীহা প্রকাশ করলেন। অতি সত্ত্বর বিয়ে করা অর্থাৎ বৌ নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং করলাম।

যাহোক বাড়িওয়ালার স্ত্রীর অনুরোধে বাড়ি ভাড়া পেলাম। একতলা বাড়ির দুইটা ইউনিট। একদিকে থাকি আমি, অন্যদিকে বাড়িওয়ালা তার স্ত্রী এবং দুই কন্যা। যদিও বড় কন্যা সব সময় থাকে না। রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ছুটি হলে আসে। কাজেই তারা স্বামী স্ত্রী দুইজন এবং ছোট মেয়েকে নিয়ে বেশির ভাগ সময় থাকেন।

এর মাস খানেক পরে বাড়িতে গিয়ে বাবা মায়ের পছন্দের মেয়েকে বৌ করে নিয়ে এলাম। অপরূপ সুন্দরী আমার বৌ। ছাত্র জীবনের ছোটখাটো যে দুই একটা প্রেমের স্মৃতি ছিল, আমার বৌয়ের মুখের হাসি এবং ভালোবাসা তা ভুলিয়ে দিল। বৌকে নিয়ে নতুন জায়গায় বেশ আরামে আছি। রুটিন মাফিক খাওয়া, ঘুম থেকে ওঠা, অফিস এবং ছুটির দিনে বৌকে সারা দিন সময় দেয়া। এইভাবেই দিন কেটে যেতে লাগলো।

বাড়িওয়ালা এবং তার পরিবারের সঙ্গে আমার ও আমার বৌয়ের ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল।

একদিন কথায় কথায় বাড়িওয়ালা বললেন, কাল গ্রীষ্মের বন্ধে আমার বড় মেয়ে ইমু বাড়ি আসছে। প্রায় মাসখানেক থাকবে।

আমার স্ত্রী বললো, বা! বেশ ভালো হবে। এক মাস বেশ আনন্দ করা যাবে।

ওই ব্যাপারটা খুব একটা গুরুত্ব দিলাম না। কে এলো, না এলো তখন আমার কাছে বড় নয়। আমার কাছে তখন অফিস আর বৌ এ দুইয়ের মাঝে আমি।

সেদিন শুক্রবার। দুপুরে খেয়ে আমরা শুয়ে আছি। আমার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়ছে। আমার ঘুম ঘুম অবস্থা। এই সময় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠলো। বিরক্তি সহকারে গিয়ে গেট খুললাম।

সুন্দর একটি মেয়ে গেটে দাড়িয়ে আছে। আমার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। সালাম বা শুভেচ্ছার কোনো বালাই না। আমি শুরু করবো। তার আগেই সে বললো, হ্যালো, আমি ইমু। বলেই হাত বাড়িয়ে দিল।

ভাগ্যিস আমার স্ত্রী ঘুমিয়ে ছিল। কাজেই ভদ্রতাবশত আমিও হাত বাড়িয়ে দিলাম।

পরের প্রশ্ন, ভাবী কই?

আমার উত্তর, ঘুমাচ্ছে।

বিকেলে আবার কিসের ঘুম! বলেই বাসার ভেতরে ঢুকে ভাবী বলে চিৎকার শুরু করলো।

আমার বৌ ঘুম থেকে উঠে ওর সঙ্গে পরিচিত হলো।

এইভাবে দুই একদিনের মধ্যে ইমু আমাদের বেশ পরিচিত হয়ে গেল। আমার অনুপস্থিতিতে ও আমার স্ত্রীর সঙ্গী হয়ে উঠলো। আমার স্ত্রীর কাছে ওর প্রশংসা শুনে দিন পার করছি।

হঠাৎ করে আমার শ্বশুরের অসুস্থতার সংবাদে আমার স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে চলে যেতে হলো।

ইমুই বললো আমার স্ত্রীর না ফেরা পর্যন্ত সেই মোটামুটি বাড়ির কাজগুলো দেখাশোনা করবে।

আমার স্ত্রী তার প্রস্তাবে বেজায় খুশি।

স্ত্রী চলে গেলে আমার ঘুম ভালো হচ্ছে না। ওকে ছাড়া ঘুমাতে খুব কষ্ট হয়। আমার লোমশ বুকের মধ্যে ওর গরম নিঃশ্বাসের উষ্ণতা এবং ওর শ্যাম্পু করা চুলের গন্ধের শূন্যতা আমাকে বেড়ে নিয়ে যেতে পারতো না। নিজেকে খুব একাকী মনে হতো। বৌকে ছাড়া থাকতে পারি না।

ইমু মাঝে মধ্যে আসে। আমার রান্নার সহযোগিতা করে। কিন্তু ওর চলাচল, কথাবার্তা, চোখের চাহনি আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে লাগলো।

এক দুপুরে অফিস থেকে এসে দেখি ও আমার জন্য টেবিলে খাবার দিচ্ছে। কিন্তু ওর শরীরে কোনো ওড়না নেই। আমাকে দেখে ওড়না দেয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করলো না।

ও আমাকে টেবিলে বসতে বললো।

আমাকে ও খাবার তুলে দিচ্ছে।

স্পষ্ট ওর বুকের ভাজ দেখতে পারছি। পাতলা কামিজের মধ্যে ব্রাহীন স্তন যুগল আমার চোখের সামনে। ইচ্ছা করেই ও যে এটা করছে তা বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু আমিও না দেখে চোখ ঘোরাতে পারছি না।

কি দেখেন, ভাত খান? ইমুর প্রশ্ন।

না, কিছু না। বলে ভাত খাওয়া শুরু করলাম।

সেই ঘটনার পরে ইমু আমার মনে আস্তে আস্তে স্থান করে নিল। এভাবে ও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতো। যখন–তখন আমার বেডরুমে চলে আসতো।

বাধা দিতে পারতাম না। কখনো ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়েছি।

ও তার প্রতিউত্তর দিয়েছে।

ও তখন আমার স্ত্রীর সম্পূর্ণ বিকল্প। আমার স্ত্রীর অভাব ও আমাকে পূরণ করে দিল।

দীর্ঘ প্রায় এক মাস ও ছিল। ওর নরম তুলতুলে ঠোঁট, সুডৌল স্তন, মায়াবী চোখ আমাকে যাদু করে রাখলো। আমার প্রতিটি আহ্বানে ও সাড়া দিচ্ছে। আমার শয্যাসঙ্গিনী হচ্ছে।

ওর ছুটি শেষ হলো। স্বাভাবিকভাবে সকালে এসেছে বিদায় নিতে। ও চলে যাচ্ছে। বললো, ভাবীকে আবার আগের মতো ভালোবাসবেন। এতোটুকুই বলে আমার ঠোঁটে চুমু দিয়ে চলে গেল।

এখানেই ঘটনার শেষ। আমার স্ত্রী দুই একদিনের মধ্যে ফিরে এলো। আমায় ছাড়া সে কিভাবে কষ্টে দিনাতিপাত করেছে তা বললো। আমি তো মহা সুখেই ছিলাম। তা বলতে পারলাম না। কোনোদিনও বলতে পারবো না।

তারপর থেকে আমার স্ত্রীর কাছে আমাকে অপরাধী মনে হতো। তাকে আগের মতো ভালোবাসতে পারি না। আমার স্ত্রী এ নিয়ে চিন্তাও করে না। কিন্তু আমার সেই অবৈধ প্রেম আমাকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকে। সাড়া দিতে পারি না।

আজ আমার ইমুর চিঠি আমাকে পুরনো ক্ষতটায় বেদনার সৃষ্টি করছে। ইমু, তোমার বিয়েতে আমি যাবো না। আমার স্ত্রী তোমাকে আজও মনে রেখেছে। তোমার নতুন জীবন সুন্দর হবে এ কামনাই সে করছে। সুন্দর স্বামী হবে, সুন্দর সংসার আর তোমার মতো মেয়ের তা হওয়া উচিত। দূর থেকে তোমাকে দোয়া করি। ভালো থেকো। আমার ভালোবাসাটুকু ভুলে যেও। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আশা করি তা যেন আর না হয়। আমার স্ত্রীর মধ্যেই যেন সব কিছু খুজে পাই।

মেহেরপুর থেকে

বিজয়ী

– শিলা

আমার তো মনে হয় *ভালোবাসা* সংখ্যায় শুধু ভালোবাসার কথা থাকবে। অবশ্য একেকজনের একেক রকম ভাবনা। আজ থাক না হয় সেই প্রসঙ্গ। ভালোবাসা কি তা স্পষ্ট করে বোঝানো যাবে না কখনো। ভালোবেসেই বোঝা যায় ভালোবাসাকে। আমিও ভালোবেসেছি একটি ছেলেকে কোনো পরিণতি না ভেবেই। প্রথম দেখায় তার একটুখানি মিষ্টি হাসির মুগ্ধতায় পাগল হয়েছিলাম। এভাবে দিন কেটে যেতে লাগলো। যখন তার পরিচয় জানতে পারলাম তখন জানলাম সে আমারই প্রতিবেশী।

স্কুল জীবনেই প্রথম প্রেমে পড়ি সেই ছেলেটির। অসাধারণ এই ছেলেটি আমাকে আকর্ষণ করতো প্রচণ্ডভাবে। সারা দিন মারপিট আর আড্ডা দেয়া ছিল তার কাজ। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা পড়শোনাও করতো জানি না কিভাবে তাকে যেন ভীষণ ভালোবেসে ফেললাম।

একদিন জানলাম সে মদেও আসক্ত। তবুও পিছপা হতে পারলাম না। কারণ ততোদিনে ওর সব কিছুকে ভালোবেসে ফেলেছি। বাবা-মা, ভাই-বোন সবার বাধা অতিক্রম করে সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছি। অদ্ভুত রকম দুরন্ত প্রেম ছিল আমাদের।

এভাবে স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলাম। অবশেষে দীর্ঘ নয় বছর প্রেম করার পর ল' ফোর্থ ইয়ারের পড়াকালীন ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি আমরা বিয়ে করলাম। আমাদের বিয়ে অবশ্য একটু অন্য রকমভাবে হয়েছিল। আমিই তার বাসায় সরাসরি উপস্থিত হয়েছিলাম তাকে বিয়ে করার জন্য। পালিয়ে নিজের ঘর ছেড়ে তার ঘরে আশ্রয় নিলাম। শুধু ভালোবাসার জন্য পৃথিবীর সব কিছুকে তুচ্ছ করে তার বুকে আশ্রয় নিলাম। শ্বশুর-বাড়ি মেনে নিলেও বাবার বাসা এখন পর্যন্ত মেনে নেয়নি।

বিয়ের পর মধুময় দিনগুলো ভালোই কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম আমার প্রেমের আকাশে শ্রাবণের কালো মেঘ। বিয়ের তিন মাস হতে না হতেই তাকে জেলে যেতে হয়েছিল রাজনীতি করার সুবাদে। অনেক ঝুট-ঝামেলার পর দীর্ঘ এগারো মাস পর হাই কোর্ট করে সে ফিরে এলো আমার কাছে। অনেক কাঙ্ক্ষিত ছিল সেই দিনটি। এদিনটির জন্য প্রতিটি দিন, প্রতিক্ষণ অপেক্ষা করেছি। এরই মধ্যে আমি অনার্স ও মাস্টার্স পাস করেছি। চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করছি। সেও টুকটাক ব্যবসা শুরু করলো কিছু সুন্দর দিনের প্রত্যাশায়।

২০০১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর অবশেষে এক কন্যা সন্তানের মা হলাম। বাবা-মায়ের কাছে সন্তান যে কোন স্থান দখল করে আছে, এই প্রথম সেটা টের পেলাম। সেদিন আমার বাবার কথা ভীষণ মনে পড়তে লাগলো। বাবার খুব কাছের মেয়ে ছিলাম আমি। সেদিন উপলব্ধি করলাম কতোখানি কষ্ট তাকে দিয়েছি। জানি না আমাকে তিনি কখনো ক্ষমা করবেন কি না?

এভাবে অনেক দিন, অনেক মাস, অনেক বছর পেরিয়েছে। ইতিমধ্যে সে মদও ছেড়েছে। তার মধ্যে অনেক কিছুর পরিবর্তন এনেছি। খারাপ পথ থেকে ভালো পথে ফিরিয়েছি। অবশ্য ওরও ইচ্ছা ছিল সুস্থ জীবনে ফিরে আসার।

১০ ফেব্রুয়ারি আমাদের সপ্তম বিয়েবার্ষিকী। এতোদিন পরও আমরা দুজনে সেই আগের মতোই আছি। আর আমি তাকে পাগলের মতো ভালোবাসি এখনো।

রাজশাহী থেকে

মূল্যহীন

- মাসুদ

পাশের বাড়ির সামনে ম্যাক্সি পরিহিতাকে অপরিচিত লাগছিল।

মাকে জিজ্ঞাসা করতে মা হেসেই অস্থির। ওকে চিনতে পারিসনি, ও আমাদের অ।

চমকে উঠলাম, এইতো দুদিন আগের কথা যেদিন কি না ওকে ওর মায়ের হাত ধরে স্কুলে যেতে দেখলাম। আজ কি না হঠাৎ করে তাকে চিনতেই পারছিলাম না। বুঝলাম হয়তো শখের বশে পরেছে। কিন্তু এতেই আমি কুপোকাত।

বন্ধুদের বলতেই তারা হেসে উড়িয়ে দিল।

অবশেষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল জুনিয়র বন্ধু সুমন।

শুরু হলো তাকে নিয়ে সকল প্রকার গবেষণা, পর্যালোচনা। উপাত্ত হিসেবে সংগ্রহ হলো স্কুল, প্রাইভেট, খেলাধুলার সময়সূচি। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা ঝুলাবে কে? এইসএসসি পাস করা এই বুড়ো আমি কি করে একটা ক্লাস এইট পড়ুয়াকে অফার করি! তাকে দেখলেই তো আমার শরীর কাপতে শুরু করে।

অবশেষে তাকে না বলতে পেরে তার এক বান্ধবীর সাহায্য কামনা করি। দীর্ঘ একটি বছর তার পেছনে বাদুড় ঝোলার পর যখন তার প্রথম চিঠি পাই তখন আর আমায় কে ধরে!

সমুদ্র জয় করার ইচ্ছে অনেক আগে থেকেই। তাই সময় মতো মেরিন একাডেমির ভর্তি পরীক্ষাও দেয়া ছিল। এরই মধ্যে রেজাল্ট হয়ে যায়। আল্লাহর অশেষ কৃপায় চান্স পেয়ে যাই স্বপ্নের একাডেমিতে।

একদিকে তাকে পাওয়া, অন্যদিকে একাডেমিতে চান্স পাওয়া - কি যে, এক সোনালি সময় কাটছিল আমার!

প্রতিদিন জোহরের নামাজ পড়ে যখন ছাদে উঠতাম তখন তাকেও পাওয়া যেতো তাদের ছাদে। কাপড় অথবা চুল শুকানোর ছলনায় সে ছাদে আসতো। কথা হতো ইশারায়। বিকেলে তার খেলার সঙ্গীদের পাহারা রেখে প্রতিদিন দেখা হতো।

একদিন তাকে মিষ্টি খাইয়ে দিতে গেলে সে আমার হাতের আঙুলে কামড় বসিয়ে দেয় মজা করে।
সে জোরে কামড় দিলেও সেদিন মোটেই ব্যথা অনুভব করতে পারিনি। বরং যখন দাগটা মুছে যেতে লাগতো তখন আবার নিজেই কামড়ে দিতাম দাগটা না মোছার জন্য।
একবার সে আমার হাত দুটো ধরে বলেছিল, এই যে তোমায় ধরলাম আর ছাড়ছি না।
নিউটনের শক্তির তৃতীয় সূত্র আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি কার্যকর। তাই এ সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। একাডেমিতে ভর্তি হবার দুদিন আগে থেকে সে আমার সঙ্গে দেখা করেনি, কথা বলেনি শুধু বারান্দায় দাড়িয়ে কেদেছে। তার বান্ধবীর মাধ্যমে জেনেছিলাম, আমার সমবয়সী তার ছোট খালা তাকে নাকি আমার নামে অনেক বাজে কথা বলেছে। আমি নাকি ওই ভদ্রমহিলার পেছনে বহু ঘুরঘুর করেছি, চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তিনি আমাকে পাত্তা দেননি। ভদ্রমহিলা বলছি। কেননা তিনি এখন অনেক সুখেই বিবাহিত জীবন কাটাচ্ছেন।
সেই যে শেষ আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। আসলে কোনো সুযোগ ছিল না। শুনেছি তার মা তার সেই বান্ধবীকে ডেকে অনেক বকা দিলেও সে কোনো প্রতিবাদ করেনি। অর্থাৎ সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের কোনো সুযোগই ছিল না।
এই ঘটনার প্রায় তিন বছর পেরিয়ে গেলেও মেয়েটি এখনো বাড়িতে বন্দী জীবন কাটায়। ফলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আবার মনে হয় যে, ভালোবাসা কি তা না বুঝেই যে ভালোবাসে তার এ রকমই তো হবে! এখন বুঝি, তার কাছে আমার ভালোবাসার দাম ছিল না। কিন্তু আমার ভালোবাসার দাম কি দিয়ে শোধরাবো?
আমি আজ একজন মার্চেন্ট মেরিন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। বিশাল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বুকের মাঝের শূন্যতাকে ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়। বন্ধুরা যখন ফোনে বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলে তখন মনে হয় ফোন কেড়ে নিয়ে পানিতে ফেলে দেই। বুঝতে পারি না, এতোসব রাগ কি তার ওপর! কিন্তু যে আমায় ভুলেই গেছে তার ওপর রাগ করে কি লাভ। ফিরে কি পাওয়া যাবে সেই স্বপ্নের দিনগুলো?

চট্টগ্রাম থেকে
anuvob_mac@yahoo.com

বাস্তব

- মোহাম্মদ ফারুক হোসেন কামরুল

আমার বাসার পাশেই মায়াদের বাড়ি। ক্লাস নাইনের ছাত্রী। তবে সে বেশ চতুর ও বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্না মেয়ে।
মায়াদের বাড়ির পাশেই আবার হুজুরের বাড়ি। হুজুর কোরআনে হাফেজ আর বাংলায় অনার্স স্থানীয় কলেজ থেকে। তার সঙ্গে আমার বন্ধুর মতোই সম্পর্ক অর্থাৎ খুবই ফ্র সব বিষয়ে। আমি একটি সরকারি ইউনিভার্সিটি থেকে কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়ে মাস্টার্সে পড়ছি। আমি দেখতে কেমন, নিজের কথা গল্প না করেও জোর দিয়ে বলতে পারি, যে কেউ আমাকে দেখলে একেবারেই পছন্দ করবে না এমনটি নই। তবে চাদের গায়েও কলংক থাকে। নিয়তি মানুষের কখনো কখনো নিষ্ঠুরভাবে কলংকিত করে। ঠিক আমার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে।
ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ারে থাকার সময়ে ডাক্তারের নির্মম প্রতারণার শিকার হয়ে শ্রবণ অনুভূতিহীন হয়ে পড়ি। অত্যন্ত বেদনাদায়ক এই ব্যাপারটিতে খুবই ভেঙে পড়ি। তবুও জীবন থেমে থাকেনি। কিছুটা বিবর্ণ হয়তো হয়েছে। কিন্তু একেবারে বর্ণহীন হয়ে যায়নি। একটা ভালো সাবজেক্টে বিএসসি শেষ করেছি এখন

এমএসসি পড়ছি। বাড়িতে ছুটিতে আসি। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় না। নিজেকে খুবই নিঃসঙ্গ অনুভব করি।

তাই এবারের ঈদে পরিকল্পনা করলাম, মায়ার সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবো। কোনো খারাপ সেন্সে নয়, শুধু অনুভূতিগুলো শেয়ার করবো। একে অপরকে জানার চেষ্টা করবো এই সময়টাতে কারণ সে অনেক ছোট।

আমার পড়ালেখা কমপ্লিট হয়ে চাকরি হওয়ার ওই সময়টাতে সে বড় হয়ে উঠবে, তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবো। এ রকম একটা পরিকল্পনাই ছিল।

হুজুরের কাছে ব্যাপারটা বললাম।

সে মায়ার সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দেবে বলে রাজি হলো।

মায়াকে প্রথম ধাপে কি বলবো সেটার একটা তালিকা তৈরি করে ফেললাম। তালিকাটি হুবহু নিচের মতো।

ভালোবাসার প্রথম পর্ব : মায়ার জন্য ভালোবাসা।

এক. তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।

দুই. তাই তুমি রাজি থাকলে এখন থেকে তোমার সঙ্গে প্রেম চলবে।

তিন. ঠিকানা দিলাম, প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি লিখবে অবশ্যই।

চার. আমি তোমার প্রতিটি চিঠির জবাব দেবো। তবে তোমার বাড়ির ঠিকানায় নয়। চিঠি লিখে এনে এখানে এসে সবগুলো এক সঙ্গে তোমার হাতে দেবো। কারণ এতে জানাজানি হবার সম্ভাবনা কম থাকবে।

পাচ. প্রায় দুই বছরের মতো প্রেম চলবে। তুমি এসএসসি পাস করবে আর আমি এমএসসি শেষ করে চাকরি হবার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

ছয়. সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, হাসি-কান্না যাই হোক, সবই দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে নেবো।

সাত. এখন থেকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ছাদে উঠবে না।

আট. অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে আর প্রেম করা যাবে না।

নয়. নিয়মিত নামাজ পড়বে।

দশ. বাড়িতে থেকে মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করবে আর অবসর সময়ে ঘরের বিভিন্ন কাজ-কর্ম করবে অথবা গল্পের বই পড়বে। অযথা ছাদে বসে আলতু-ফালতু ছেলেদের সঙ্গে টাটা বিনিময় করবে না।

এগারো. রাস্তা দিয়ে হাটার সময় এদিকে-সেদিক তাকাবে না। শুধু সামনের দিকে, নিচের দিকে চেয়ে হাটবে। কোনো বাজে ছেলে কোনো মন্তব্য করলে কোনো জবাব দেবে না।

বারো. এখন থেকে স্কুলের কোনো ছেলের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করবে না। কেউ কোনো প্রস্তাব দিলে এড়িয়ে চলবে এই বলে যে, এক কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বাস না করলে আমার কার্ডটা তাকে দেখাবে।

তেরো. পড়ালেখার ব্যাপারে সিরিয়াস হবে, প্রয়োজনে ইতির সাহায্য নিতে পারো। কারণ ইতি ভালো স্টুডেন্ট।

চোদ্দ. আমার ব্যাপারে আর কোনো কিছু জানার থাকলে চিঠিতে প্রশ্ন করতে পারো অথবা হুজুরের সঙ্গেও আলাপ করতে পারো। কারণ হুজুরকে দিয়ে আমার আর তোমার কোনো ক্ষতি হবে এটা বিশ্বাস করি না। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ভালো চান। যেমন আমি ওনার মঙ্গল কামনা করি।

পনেরো. আমি ২৫ তারিখের দিকে চলে যাচ্ছি। যদি গিয়ে দশ দিনের মধ্যে চিঠি না পাই তবে মনে করবো প্রেম হয়নি। কিছুটা কষ্ট পেলেও মনে কিছু করবো না। অন্যজনের সন্ধান করবো।

ষোল. আমি এখনই তোমাকে একান্তে পেতে চাই না। কারণ আমি মনে করি তুমি এখনো বেশ ছোট, বয়স কম। কাজেই দুই বছর প্রেম চলুক তারপর...।

সতেরো. তুমি আমাকে পছন্দ নাও করতে পারো, সেটা তোমার ইচ্ছা। তবে আমাকে পছন্দ না করলেও তোমার কাছে অনুরোধ থাকবে, উপরে যে কথাগুলো লিখেছি, উপদেশ দিয়েছি এগুলো মেনে চলার চেষ্টা করবে। এতে তোমার জীবনের জন্য ভালো হবে বলে মনে করি। আর তোমাকে পছন্দ করি বলেই তোমার ভালো হোক এটা আমি চাই।

আঠারো. আশা করি উপরের কথাগুলো গুরুত্ব সহকারে নেবে। কারণ তোমার সঙ্গে হাসি–ঠাট্টা বা নিছক মজা করছি না। আমি ব্যাপারটায় সিরিয়াস।

উপরের বিষয়গুলোর সঙ্গে একমত কি না টিক দাও।

(ক)–তে টিক দিলে বুঝবো প্রেম হয়েছে।

(খ)–তে টিক দিলে বুঝবো প্রেম হয়নি অর্থাৎ তুমি ভালোবাসোনি :

(ক) হ্যা (খ) না

কথা ছিল নির্দিষ্ট দিনে হুজুর আমার বাসায় এসে বসে থাকবেন। মায়া স্কুলে যাওয়ার পথে হুজুর মায়াকে ডেকে দেবেন আর আমি তালিকাটি তার হাতে দেবো। সে পড়ার পর একটা সিদ্ধান্ত দেবে তারপর তাকে আরো কিছু কথা বলবো।

কথা অনুযায়ী সময় ঘনিয়ে এলো। সকাল সাড়ে সাতটায় মায়া স্কুলে যাবে। মায়া হুজুরকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল সে সকাল সাড়ে সাতটায় স্কুলে যাবে।

আমি সকালে উঠে মায়ার অপেক্ষা করতে থাকি। সকাল সোয়া সাতটা বেজে যায়, হুজুর আসে না। ঠিক সাড়ে সাতটার সময় মায়া ওর বান্ধবীর সঙ্গে যাওয়ার সময় জানালা দিকে মায়াকে ডাক দিই।

মায়া জানালার সামনে আসে।

তাকে ভেতরে আসার আহ্বান জানাই।

কিছুটা ইতস্তত করলেও সে তাই করে।

অতঃপর তালিকাটি তার হাতে দিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তে বলি, সে পড়তে থাকে।

পড়া শেষ হবার পর আমি তাকে তালিকাতে লেখা অনুযায়ী টিক দিতে বলি।

সে হ্যাঁ, না কোনোটিতে টিক না দিয়েই তার বান্ধবীর সাথে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

আমার মনে খটকা লাগে। উভয় সংকট অবস্থার মধ্যে পড়ে সাতপাচ ভাবতে থাকি। মনে মনে ভীষণ রাগ হয় হুজুরের ওপরও, সেই মুহূর্তে আমার সঙ্গে না থাকার জন্য। এক পর্যায়ে হুজুরকে ছাড়াই বিষয়টা সুরাহা করার চিন্তা করি। সে অনুযায়ী ইতির কাছে যাই তার সাহায্য নেয়ার জন্য।

ইতির বাড়িও মায়াদের বাড়ির পাশেই এবং সে খুবই মেধাবী ও অত্যন্ত ভালো স্বভাবের মেয়ে। এবার এসএসসি দেবে।

ইতির কাছে বিস্তারিত বলার পর সে মায়ার মতো মেয়ের সঙ্গে এ রকম একটা সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে ওর অনিহা বলেই আমার মনে হলো। তবুও ইতিকে অনেক বোঝানোর পর সে মায়ার কাছ থেকে একটা সিদ্ধান্ত এনে দিতে রাজি হলো।

এরপরের দিন সকাল সাড়ে নয়টায় ঘুমিয়ে রয়েছি। হুজুর এলেন। তার বোনের বিয়ের ব্যবস্থার কারণে আসতে পারেননি বলে জানালেন। তবে তিনি আমাকে মায়ার কাছ থেকে সিদ্ধান্ত এনে দিয়েছেন। আগের দিন রাতেই হুজুরের সঙ্গে মায়ার আলাপ হয়েছে বলে বলেন।

হ্যা, মায়া সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সে ব্যাপারটাতে রাজি নয় বলেই জানিয়েছে।

ও যে প্রস্তাবটিতে রাজি হয়নি তাতে কিছুটা মর্মাহত হলেও বিস্মিত হইনি। কারণ ওর বয়স কম, জীবনকে বুঝতে শেখেনি। তাই তো ও শুধু আমার বাহ্যিক ক্রটিটাই ধরেছে, আমার ভেতরটা আবিষ্কার করতে পারেনি। আমার অন্য বৈশিষ্টগুলো ওর কল্পনার পর্দায় ঢাকা রঙিন চোখে ধরা পড়েনি।

আসলে সীমাহীন নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর জন্যই ওকে চেয়েছিলাম। অপবিত্র বা নষ্ট করার জন্য ওকে চাইনি। চেয়েছিলাম তার সম্বন্ধে, তার পরিবার সম্বন্ধে যা কিছু জেনেছি সেগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি আর না হয়, মায়া যেন আলোর পথে ফিরে আসে।

উল্লেখ্য, মায়া তার সহপাঠী ক্লাস এইটের এক ছাত্রের সঙ্গে প্রেম করেছিল এবং নিজের হাত কেটে রক্ত বের করে তাকে চিঠিও দিয়েছিল। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর মায়ার বাবা–মা তাকে সে পথ থেকে সরে আসতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

হ্যা, আমার এ রকম অবস্থাতে একটা অক্ষমতা হয়তো সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অযোগ্য তো আমি নই। আর আমি তো আমাকে জানি।

আশা করি মায়ার চেয়ে অনেক শ্রেয়তর মেয়ে পেতে আমার কোনো সমস্যা হবে না। আমার যোগ্যতা প্রমাণ করেই ভালো কিছুর আশা করবো।

এভাবেই একটা স্বপ্ন ভঙ্গের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিসমাপ্তি ঘটলো।

কুষ্টিয়া থেকে

জয়ী

– মুন্নি

আমার শৈশব কেটেছে রাঙামাটি জেলার চন্দ্রঘোনা নামের এক মফস্বল শহরে। বাবা চাকরি করতেন কর্ণফুলি পেপার মিলে। রিটায়ার করার পর আমরা সপরিবারে গ্রামের বাড়ি চলে আসি।

গ্রামে আমাদের বাড়ির পাশেই আমার জেঠার বাড়ি। জেঠাতো ভাই সাহাব আমার চেয়ে চার পাচ বছরের বড়। উজ্জ্বল ফর্শা রঙ, আর স্মার্ট এই ছেলেটির মুখে হাসি থাকতো সব সময়। বড় হিসেবে খুব ভয় করতাম তাকে। কিন্তু তার চোখে চোখ পড়তেই খুজে পেতাম অন্য ভাষা আপন করে নেয়ার এক রহস্যময় আহ্বান।

যখনই ও আমাদের বাসায় আসতো, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতো, অনেক কাজ ফেলে এসেছি কারো হাতের এক কাপ চা খাওয়ার জন্য। খুব বেশি কষ্ট হলে আজ না হয় থাক।

তখন বাধ্য হয়ে ওকে চা খাওয়াতে হতো।

ওর এসব দুষ্টামি প্রথম প্রথম বিরক্ত লাগলেও পরে কেন জানি ভালো লাগতে শুরু করলো। ওর ব্যক্তিত্ব, কথা বলার ধরন, হাসি সব মিরে অসাধারণ মনে হতো। কিন্তু এসব ব্যাপার যথাসাধ্য এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম। কেননা পারিবারিক কিছু কারণে দুই পরিবারের কেউ এ সম্পর্ক মেনে নেবে না কখনো।

১৯৯৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি।

সবার অলক্ষ্যে হাতে কিছু ফুল আর একটা চিঠি নিয়ে ও আমাদের বাড়ি এলো। আমার হাতে ফুলগুলো আর চিঠিটা দিয়ে বললো, আজ ভালোবাসা দিবস। আমার ভালোবাসা শুধু তোমার জন্য, বলেই চলে গেল।

ফুলগুলো রেখে চিঠিখানা পড়তে বসলাম। এতো সুন্দর করে কেউ ভালোবাসার কথা লিখতে পারে এবং এতো চমৎকার হাতের লেখা মনে হলো সেদিনই প্রথম দেখলাম। প্রেমে পড়ে গেলাম সেই লেখার, তার সঙ্গে লেখার মানুষটির। ভুলে গেলাম পারিবারিক নিষেধাজ্ঞার কথা।

কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। আমার মনের কথা লিখলাম সুন্দর করে।

পরের দিনই ও এলো তার চিঠির উত্তর নিতে।

আমি ভয় আর লজ্জা মেশানো হাতে চিঠিখানা এগিয়ে দিয়েই সেখান থেকে চলে এলাম। পরের দিন আবার সে সহাস্যবদনে হাজির। এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, থ্যাংক ইউ মুন্নি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

ওর হঠাৎ এমন আচরণে যতোটা না ভয় পেয়েছি তারচেয়ে বেশি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, কি হচ্ছে এসব! কেউ দেখলে কি বলবে?

ও বললো, সরি। আসলে তোমাকে পাওয়ার খুশিতে স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

সেই থেকে ভালোবাসার যমুনায় আমরা দুজন এক সঙ্গে তরী ভাসালাম। এক সুতায় বেধে দিলাম দুটি আত্মা। ভাসতে ভাসতে তরী যখন মাঝ দরিয়ায় ঠিক তখনই উঠলো ঝড়।

দুই পরিবারে জানাজানি হয়ে যায় আমাদের সম্পর্কের কথা। এক পর্যায়ে ওকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ঢাকা।

যাবার আগে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। অশ্রুভরা চোখে আমার হাত দুটি ধরে বলেছিল, শুধু আমার জন্য অপেক্ষা করো।

অশ্রু ছাড়া তখন তাকে কিছুই দিতে পারিনি।

শুরু হলো আমার একাকীত্বের জীবন। সঙ্গী হলো এক বুক কষ্ট আর অশ্রু। নিজেকে বড় অসহায় মনে হতো তাকে ছাড়া। কতোটা কেদেছি, কতো রাত ঘুমাইনি, ঠিকমতো খাইনি তার হিসাব মেলানো মুশকিল।

তিন চার মাস পরে একবার বাড়ি আসতো, দেখা হতো খুব দূর থেকে। কথা বলার সুযোগ ছিল না মোটেও। এভাবেই কেটে গেল দীর্ঘ তিনটি বছর।

তারপর একদিন হঠাৎ আমার এক ভাই আর ভাবী এলেন বাড়িতে বেড়াতে। তারা অনেক কষ্টে বাবা মাকে রাজি করিয়ে আমাকে নিয়ে এলেন তাদের সঙ্গে ঢাকা। তারা আমার মুখে সব ঘটনা শুনে সাহাবকে ফোন করলেন।

সাহাব এসে আমাকে দেখেই পাগলের মতো জড়িয়ে ধরলো।

আমিও ছোট্ট শিশুটির মতো নিজেকে লুকিয়ে নিলাম সাহাবের বুকে। এভাবে কতোক্ষণ কেটেছে বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ ভাই-ভাবীর ডাকে সংবিৎ ফিরে পেয়ে দুজন আলাদা হয়ে গেলাম।

দুজনের চোখেই অশ্রু দেখে ভাবী বললেন কি ব্যাপার, মিলনের দিনে অশ্রু কেন।

ভাইয়াও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বললেন, আরে? এটা দুঃখের অশ্রু নয়, এটা সুখের অশ্রু। সেদিন আরো কিছুক্ষণ থেকে সে আমার কাছ থেকে বিয়ের সম্মতি নিয়ে বিদায় নিল।

পরের দিন সন্ধ্যার পর ওর সঙ্গে ওর এক বন্ধু আর কাজি নিয়ে হাজির হলো ভাইয়ার বাসায়।

ভাবী আমাকে সাজিয়ে নিয়ে এলেন।

যথাসময়ে শুভ কাজটি সম্পন্ন হলো। অনাড়ম্বর এক পরিবেশে আমরা আবদ্ধ হই মহা মিলনের সুতায়।

আমার স্বামী বড় অফিসে ভালো বেতনে চাকরি করে এখন। একমাত্র কন্যা আর ভালোবাসার মানুষটি নিয়ে আমার সোনার সংসার এখন সুখে পরিপূর্ণ।

এখনো ভালোবাসা দিবস এলে নিজের অজান্তেই ফিরে যাই অতীতের দিনগুলোতে। বর্তমানের অবস্থায় দাড়িয়ে যখন মনে হয় ভালোবাসার মাঠে আমরা জয়ী তখন বুকটা ভরে ওঠে এক বিশাল তৃপ্তিতে।

আরো ভালো লাগে কারণ পরবর্তীকালে দুই পরিবার আমাদের সম্পর্কটা মেনে নিয়েছিল।

মধ্য বাড্ডা, ঢাকা

সংযমী

– টিপু

ঈদ পুনর্মিলনী ছিল আমাদের স্কুলে। অনুষ্ঠানে অধিকাংশ মেয়েই শাড়ি পরে এসেছে। সবার মাঝে তাজিনকে খুব ভালো লেগেছিল। খয়েরি রঙের একটা শাড়িতে সেজেছিল তাজিন। সেই ভালো লাগা থেকে তানিজকে নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলাম।

তাজিন আমার স্কুল জীবনের ক্লাসমেট। অবশ্য এখন সে আর আমি সমানে নেই। সে বিএ ফার্স্ট ইয়ারে আর আমি অনার্স লাস্ট ইয়ারে।

প্রথমে তাকে নিয়ে চিন্তা করেছিলাম আমার বড় ভাইয়ার জন্য। ভাইয়ার জন্য এ রকমই একটা বৌ দরকার, যে নাকি আমার সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের পরিবারটাকে আমার মনের মতো করে গড়তে আমাকে সহায়তা করতে পারবে।

বন্ধু আজহারকে দিয়ে তানিজের কাছে সরাসরি প্রস্তাব পাঠালাম।

তাজিন সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রত্যাখান করলো এবং আমর উদ্দেশ্যে বললো, *চাইলেই হলো?*

আজহার তখন দুষ্টমি করে বলেছিল, ভাইয়ের সঙ্গে না হয় রাজি হলে না, ওর সঙ্গে প্রেম করো।

তখন তাজিন নাকি কোনো কিছু না বলে হেসেছিল। এরপর আমার সম্পর্কে আজহারের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে আমাকে সরাসরি দেখা করতে বললো।

আজহারের কাছ থেকে সব শোনার পর তাজিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য দিওয়ানা হয়ে উঠলাম।

আমি কুমিল্লায় পড়াশোনা করি আর তাজিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অর্থাৎ বাড়িতে। তাজিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য পরের দিনই গেলাম বাড়িতে।

আমাকে দেখে তাজিন অবাক হলো না। ভাবটা এমন ছিল যে, আমি তার প্রত্যাশিত। মিটি মিটি হাসলো। তার হাসির মানে বুঝতে পারলাম না। তবে আমার অনুভূতি তখনো স্বাভাবিক ছিল। জীবনে প্রথম প্রেম করতে যাচ্ছি, কেন জানি অনুভূতির কোনো পরিবর্তন হলো না, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

তাজিনের রুমে আমরা দুজন মুখোমুখি বসলাম। বললাম, তোমার সিদ্ধান্তের কথা বলো।

সে বললো, কিসের সিদ্ধান্ত?

তবে যে আমি এলাম।

সেটা তুমি জানো।

হেয়ালি রেখে কাজের কথা বলো।

সে হাসলো, কোনো কথা বললো না।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তাজিন বললো, আমাকে কেমন লাগে তোমার কাছে?

খুবই কুৎসিত।

সে বললো, কুৎসিত মেয়েদের সঙ্গে কেউ প্রেম করে নাকি?

বললাম, এই যে আমি করছি।

তুমি একটা বোকা।

আসলেই আমি একটা বোকা।

বিকাল তিনটায় রামরাইলে এসো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে রামরাইল ফিশারি নামের স্থানটি এই এলাকার প্রেমিক প্রেমিকাদের প্রিয়। প্রেম করার পরিবেশ এখানে রয়েছে।

দুজনেই রামরাইল ফিশারিতে পৌছালাম। জীবনে প্রথম কোনো প্রেমিকা নিয়ে কোনো পার্কে বসলাম। এক হাত দূরত্ব বজায় রেখে তাজিন আর আমি পাশাপাশি বসলাম। বললাম, কেমন লাগছে তাজিন?

অন্য রকম।

যেমন?

সে বললো, ভাষা নেই।

তাজিন তুমি কি একবারও ভেবে দেখেছো, তুমি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছ কি না। আমি তোমার ক্লাসমেট ছিলাম। সেই অর্থে আমি তোমার সমবয়সী। অন্যদিকে গ্রামের মেয়ে হিসেবে তোমার বিয়ের বয়স আরোও আগেই হয়েছে।তাছাড়া আমার প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া কোনো কিছু করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তারচেয়ে ভালো, তুমি আমার সম্পর্কে, আমার চরিত্র সম্পর্কে আরো জেনে সিদ্ধান্ত নাও।

এবার তাজিন বললো, তুমি আমাকে এতো বোকা ভেবো না যে, চিন্তা ভাবনা ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি এক সময় আমার ক্লাসমেট থাকলেও এখন আমার চেয়ে দুই বছরের সিনিয়র। আমি স্বাবলম্বী হওয়া ছাড়া বিয়ে করবো না সেটা আমার বাবা মাও জানে। আমার পড়া লেখা শেষ হতে অর্থাৎ ডিগ্রি পাস করতে করতে তুমিও মাস্টার্স করতে পারবে। তারপর দুজনে এক সঙ্গে স্বাবলম্বী হয়ে বিয়ে করবো।

পরস্পরের কথা শুনে দুজনেরই ভালো লাগলো। বললাম, জানো তাজিন, পুনর্মিলনীতে তোমাকে শাড়িতে আমার বৌ মনে হয়েছিল।

তাজিন মিষ্টি হেসে জবাব দিল, তোমাকেও পাঞ্জাবিতে আমার ইয়ে মনে হয়েছিল।

দুজনেই হাসলাম।

এরপর আমাদের মাঝে কথা হলো জীবন সম্পর্কিত বাস্তবতা নিয়ে। পরস্পর সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাদের প্রেম হবে বাস্তববাদী। কিশোর কিশোরীর প্রেমের মতো। বেশি আবেগ প্রবণ হলে আমরা জীবনের কাছে হেরে যাবো। দুজনেই সংযমী ও সতকর্তা অবলম্বন করে প্রেম করবো।

বিকেলের সূর্য যখন ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে এক সময় আড়াল হলো, আমরাও অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠলাম।

আমি কুমিল্লায় আর তাজিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। দুজনের মাঝে ফোন, পত্র যোগাযোগ চলতে লাগলো। ফোনে প্রায়ই সে শুধু সাক্ষাতের কথা বলতো। অতি আবেগপূর্ণ কথাবার্তা বলতো। আমি তাকে বোঝালাম, আমাদের মাঝে এমনটি কথা ছিল না।

আমাদের প্রেমের কয়েক মাস পর আমাদের দ্বিতীয়বার ডেট হলো। সেদিন শুধু শহরের অলিগলিতে হেটেছি আর রিকশায় চড়েছি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তা বাড়ি ফেরার জন্য রিকশায় উঠলাম। উদ্দেশ্য আরো কিছু সময় দুজনে এক সঙ্গে কাটানো। যতোক্ষণ রিকশায় ছিলাম, খুব ভালো লেগেছিল। মাঝে মধ্যে ওর কোমল শরীরের স্পর্শে আমার অনুভূতি বদলে যেতো। সেদিন রিকশায় তাকে একটা কিস দিয়েছিলাম।

সত্যিই প্রথম স্পর্শ, প্রথম চুমু তুলনাহীন।

তাজিনকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে লাগলাম। স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, আমার দুঃখিনী মায়ের কষ্ট গোছাতে তাজিন সক্ষম হবে। সহজ সরল মা আমার যদি ছেলের বৌ দ্বারা কোনোক্রমে কষ্ট পায় তা সহ্য করতে পারবো না। আমার মা আমার সব কিছুর উর্ধে। এসব দিক চিন্তা করেই তাজিনের মতো একটা মেয়ে বেছে নিলাম জীবনের জন্য। দুজনে একযোগে কাজ করবো, ছোট ভাইবোনদেরকে মানুষ করবো, সংসার ছোট রাখার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবো দুজনে মিলে।

আমাদের তৃতীয় এবং শেষ ডেট হলো ঈদের তিন দিন আগে। সেই রামরাইল ফিশারিতে দুজনে পুরোটা বিকেল প্রেমালাপে কাটালাম। আগের মতো সন্ধ্যা হতেই রিকশা নিলাম। রিকশা চলছে আবছা অন্ধকারে কালো পিচের রাস্তায়। কথা বলছি না কেউ। অন্য রকম একটা নীরবতা বিরাজ করছে।

তাজিন আমার হাত ধরলো। কিছুক্ষণ পর হাতে একটা চুমু খেলো। এরপর আমার একটা হাত তার পেছনে দিয়ে তাকে জড়াতে বোঝালো। আমি তাই করলাম। পরিপূর্ণ আবেগ জড়ানো কণ্ঠে সে আমার কানের কাছে এসে ফিশফিশিয়ে বললো, আই লাভ ইউ।

আমিও থেমে থাকিনি। তার ঠোটে ঠোট রেখে বলতে লাগলাম, আই লাভ ইউ টু।

অসংখ্যবার চুমু খেলাম। তাজিনের গালে, কপালে, গলায় এবং ঠোটে। উত্তেজনার চূড়ান্ত স্কেলে দুজনেই। তার পেছনে রাখা আমার হাতটা তাকে জড়িয়ে তার বুকের একাংশে বিচরণ করতে লাগলো। হাল্কা আপত্তি করেছিল তাজিন। পরে প্রচণ্ড উত্তেজনায় সে নিজেই আমাকে সব বিলিয়ে দিতে চাইলো। তার বুকের স্বর্গীয় বস্তুর স্বর্গীয় স্বাদ অনুভব করলাম অনেকক্ষণ। তাজিনের ব্রেস্ট খুব বড় নয়। তবে খুব সুঠাম। সে ব্রা পড়তো না। রিকশায় বসে নিবিড় ভালোবাসাবাসির মাঝে এক সময় আমরা গন্তব্যে চলে এলাম।

রিকশাচালক আমাদের সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারলো কি না তা আমরা খেয়াল করিনি।

রিকশা থেকে নামলাম। চারদিকে তখন অন্ধকার। তাজিনকে বাড়ি পৌছে দিতে হবে। নির্জন সরু রাস্তা দিয়ে একটু পথ হেটে যেতে হবে। দুজনে চলছি অন্ধকারের মাঝে। ওদের বাড়ির প্রায় কাছে এসে একটা স্থানে দুজনে দাড়ালাম। তাজিনকে শেষ চুমু দিয়ে বিদায় জানাবো সেই উদ্দেশ্যে ওর ঠোটে ঠোট রাখলাম। তাকে জড়িয়ে ধরলাম। ছাড়তে ইচ্ছ হলো না। সেও আমাকে আরো শক্ত করে ধরলো। কিছুক্ষণ পর সে তার নিম্নাংশ দিয়ে আমার নিম্নাংশ বরাবর জোরে চাপ দিতে লাগলো। আমিও তাই করলাম। আমরা পরস্পরের আরো কাছে যেতে চাইলাম। সেই মুহূর্তে দূর থেকে টর্চের একটা আলো আমাদের গায়ে পড়লে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। সে ঘরে চলে গেল আর আমি পেছনে দৌড়ে পালালাম।

কথা ছিল ঈদের দিন বিকেলে সে শাড়ি পরবে এবং সেই পার্কে আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

আমি বাড়িতে এসে ভাবনায় পড়ে গেলাম। আমি এসব কি করতে যাচ্ছি। আমাদের মাঝে কি কথা ছিল আর কি হচ্ছে! কোনো নারীর এমন গভীর স্পর্শ জীবনে এটাই প্রথম। নারীর দেহের প্রতি আমার চাওয়া বাড়তে লাগলো। আমি উন্মাদের মতো চিন্তা ভাবনা করছি।

ঈদের দিন ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিলাম তাজিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো না। কারণ সাক্ষাৎ করলে আজ অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারে। আজ আরো সে শাড়িতে অপরূপ হয়ে আসবে। নিজেকে সংযত করতে পারবো না।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঈদের দিন দেখা হলো না তাজিনের সঙ্গে।

সেই থেকে সে আমাকে ভুল বুঝলো।

অনেক চেষ্টা করেছি ভুল ভাঙাতে। পারিনি। পারিনি আমার স্বপ্নকে ফেরাতে।

অবশেষে জানা গেল, সেই তাজিন তার পুরনো প্রেমিকের সঙ্গে এক সিনেমার কাহিনী ঘটিয়েছে। সেই শুনে তার প্রতি ঘৃণা জন্মালো। ভালোবাসাগুলো মরে গেল। পাওয়া হলো না মায়ের জন্য ছেলের আদর্শ বৌ।

কুমিল্লা থেকে

নরপশু

২০০১ সাল। আমি তখন কাদিরাবাদ ক্যান্ট পাবলিকের ক্লাস এইটের ছাত্রী। সামনে বৃত্তি পরীক্ষা। শুনলাম ইংরেজি স্যার যার মাথায় বিশাল এক টাক তার কাছে পড়লে বৃত্তি কনফার্ম। তিনি বৃত্তির স্পেশাল কোচিং করান।

বাবাকে বললাম।

বাবা আর্মি অফিসার। তাই স্যারকে বাসায় এসে পড়াতে বললেন।
তিনি অনেক বাসাতেই পড়ান। তাই রাজি হলেন।
স্যার সুন্দর করে কথা বলেন। তার কথাতে যে কেউ কুপোকাত হবে।
তার প্রথম দিনের উপদেশে মুগ্ধ হলাম। বিপুল উৎসাহে পড়তে লাগলাম।
কিছু দিন পর তার বাসায় গিয়ে বৃত্তির অন্য ছাত্রদের সঙ্গে পড়তে লাগলাম।
আমার হাতের লেখা খারাপ।
তিনি আমার হাত ধরে লেখা ভালো করার কসরত করালেন। সেই সময়ে তিনি হাতে কেমন যেন চাপ দিলেন।
যা হোক, বৃত্তি পরীক্ষায় প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ফল পেলাম। ট্যালেন্ট পুল। স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।
ইতিমধ্যে শুনলাম স্যারের পারিবারিক ঝড়ের কথা। আন্টির পরকীয়ার কারণে তাদের প্রায় ডিভোর্স হতে চলেছে।
স্যারের ওই দুর্দিনে পাশে দাড়ালাম। তার প্রতি শ্রদ্ধা কখন যে ভালোবাসায় রূপ নিলে বুঝলাম না।
এক সময় তিনি আমার ভালোবাসার ভাষা বুঝতে পারলেন। সামনে এসএসসিতে ‘এ’ প্লাস পাওয়ার স্বপ্ন দেখালেন।
স্যারের পারিবারিক সমস্যা কিভাবে যেন মিটে গেল।
বাসায় বাবা থাকলে পড়ার বাইরে কোনো কথা হতো না। তাই চিঠি লিখে ভালোবাসা প্রকাশ করতাম।
বাবার বদলি হলো। স্যার ও আমার সুপারিশে বাবা একাই গেলেন। স্যারদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন।
বাবা চলে যাওয়ায় আমাদের ভালোবাসা নির্বিঘ্ন হলো।
স্যার পড়ানোর চেয়ে গল্প করতে এবং হাতের লেখা ঠিক করতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার হাতের চাপের অর্থ বুঝতে পারলাম। মন সায় দিচ্ছিল না। তাই অন্য কিছু হলো না।
মা অল্প শিক্ষিত। মা আমার ও ছোট ভাইয়ের জন্য এখানে আছেন। হঠাৎ মা একদিন খবর আনলেন স্যার অন্য এক অফিসার আংকলের মেয়ের হাত ধরে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন যা আমাকে ভালোবাসার টানে অনেকবারই ধরেছেন।
শুনে আমার খটকা লাগলো। মন আমার খারাপ হলো। জীবনে হঠাৎ করেই যেন পরিবর্তন হলো। স্যারের আরো কুকীর্তি প্রকাশ হতে লাগলো।
শুনলাম এমইএস-এর এক সাবইঞ্জিনিয়ারের মেয়ের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কের কথা। আন্টির পরকীয়ার কারণ বুঝতে পারলাম।
স্যারকে কিছু না বলে পড়তে লাগলাম।
একদিন মায়ের ঘুমানোর সুযোগে স্যার তার স্বরূপ উন্মোচন করলেন।
আমি দেখতে ভালো নই।
স্যারের মূল আকর্ষণ ছিল আমার বাড়ন্ত স্তন। তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও তিনি আমাকে ভালোবাসার দোহাই দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে ও দুটো খামচে ধরলেন।
শুরু হলো ধস্তাধস্তি।
মা জেগে ওঠে তা দেখে ফেললেন।
স্যারকে তিনি ও আমি দুজনেই আসতে নিষেধ করে দিলাম।
পড়াশোনা ছেড়ে দিলাম।
বাবাকে স্যারের অন্য মেয়েদের সঙ্গে কুকীর্তির কথা মা জানালেন।

বাবা টেলিফোনে সান্ত্বনা দিলেন এবং অন্য স্যার ঠিক করতে বললেন।

আমি এক বৃদ্ধ অংক স্যারের তত্ত্বাবধানে পড়তে লাগলাম।

বান্ধবীদের কাছে আমার সম্পর্কে স্যারের তির্যক মন্তব্য শুনে উঠেপড়ে লাগলাম পড়াশোনায়।

পরীক্ষা এসে গেল।

স্যার হুমকি দিলেন আমি কিভাবে 'এ' প্লাস পাই তা তিনি দেখে নেবেন।

বাবাকে জানালাম।

আমাদের কেন্দ্র ছিল উপজেলায়। পরীক্ষার প্রথম কয়েকদিন বাবা ছুটিতে এসে আনা-নেয়া করলেন।

পরীক্ষার প্রথম দিন হই-হট্টোগোলে বুঝতে পারলাম স্যারের দুর্নীতির হাত কতো দূর বিস্তৃত। যে যার ইচ্ছে মতো বসেছে। আর্মির ভয় এবং স্যার ওই কেন্দ্র স্কুলের টিচার ছিলেন বলে তিনি প্রভাব খাটিয়ে হল ফ্রি করে নিয়েছেন।

পরীক্ষা শেষে বাবা ও আমি টিএনও-র কাছে নালিশ করলাম।

স্যার আরো ক্ষেপে গেলেন। তার শিষ্য বিজ্ঞানের এক বেটে খাটো স্যারের দ্বারা প্র্যাকটিকালে দেখে নেবেন বলে হুমকি দিলেন।

তবে নতুন হেডস্যার জয়েন করায় তার সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তবু শিষ্য ওই বিজ্ঞান স্যার (ব্যবসায়ী!)-কে টাকা দিয়েছিলেন।

ফলাফল হলো। 'এ' প্লাস পেলাম, কিন্তু ইংরেজি ছাড়া।

বুঝলাম স্যারের কালো হাত আমার ইংরেজি খাতা পর্যন্ত গড়িয়েছে।

স্যার সম্পর্কে শোনা সব কথা বিশ্বাস হলো। স্যার ও তার শিষ্য ছাত্র পড়ানোর নামে ব্যবসা করেন। আর্মিদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে তাদের মন জয় করেন। হেডস্যারের চামচামি করে ক্ষমতার দাপট দেখান। শিষ্যের সঙ্গে দুজন মিলে কেন্দ্রে প্রভাব খাটিয়ে খাতা ঠিক করা, টপসিটে গোলোযোগ করে ফলাফল পর্যন্ত তারা স্থগিত করেছিল যা ওই স্কুলে এবারই প্রথম। তাদের কাছে না পড়ায় এবার ছয়জন ছাত্রছাত্রীর টপসিটে পরিবর্তন করে তাদের ক্ষোভ মিটিয়েছে।

এর অবসান কে করবে?

এসব শিক্ষক নামের ব্যবসায়ী নরপশুদের রুখবে কে?

এদের হাত থেকে ছাত্রছাত্রীকে রক্ষা করবে কে?

নাম ঠিকানা বিহীন

না বলা কথা

– সামিনা হক

বাবা একটা কম্পানিতে চাকরি করতেন। আমরা গ্রামের বাড়িতে থাকতাম। বাবা সপ্তাহে একদিন বাড়িতে আসতেন আর আমাদেরকে ভালোবাসার ফলস্বরূপ চকলেট, বাদাম এবং অন্যান্য ফলমূল আনতেন। তাই প্রতি সপ্তাহে বাবার আসার অপেক্ষায় থাকতাম। যখন বাবা এসে এগুলো সব ভাইবোনকে ভাগ করে দিতেন তখন বাবার প্রতি আমার ভালোবাসা প্রগাঢ় হতো। মনে মনে বলতাম, আমার বাবা কতো ভালো!

ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত কতো প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েছি! তাদের মধ্যে দুজনের কথা উল্লেখ করছি। যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন যে স্যারের কাছে পড়তাম, তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আর আমাকে সবাই ভালোবাসে। কারণ আমি নাকি ভদ্র, শান্ত এবং সুন্দর। তাই তো সবার চেয়ে আমার প্রতি তার মনোযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। আমাকে তিনি তার পাশে বসিয়ে পড়াতেন। আমি ছিলাম তার প্রিয়পাত্রী।

আমাকে তিনি অনেক আদর করতেন। পড়ানোর পর সবাই চলে গেলে আমাকে ডেকে মিষ্টি খাওয়ার জন্য টাকা দিতেন আর বলতেন, রেজাল্ট ভালো করলে তোমাকে একটা উপহার দেবো। যদিও পড়াশোনায় ভালো ছিলাম। অবশ্য তিনি আমাকে একটা সুন্দর কলম দিয়েছিলেন। যখন ক্লাস এইটে পড়ি, বাবা আমাকে অন্য একটি স্যারের কাছে পড়তে দিয়ে এলেন এবং বললেন, এখন থেকে প্রতিদিন এখানে পড়তে আসবে।

তার কথামতো সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে স্যারের কাছে পড়তে যেতাম। স্যার একটা বাসায় ভাড়া থাকতেন। আমরা সেখানে পাচজন পড়তাম। সবার মাঝে আমিই ছিলাম একমাত্র মেয়ে। স্যারের কোনো মেয়ে ছিল না। ছিল দুইটি ছেলে। তিনিও আমাকে বেশ ভালোবাসতেন। প্রতিদিন গিয়ে দেখতাম এক দুজন এসে গেছে।

একদিন আমি সবার আগে হাজির।

স্যার আমাকে বসতে বলে বাইরে থেকে মুখ ব্রাশ করে রুমে এসে হাত মুখ মুছে আমার পাশে বসলেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার কপালে চুমু দিলেন আর বললেন, তুমি খুব ভালো মেয়ে।

এ অবস্থার পর আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, কেন তিনি আজ এমন করলেন? আবার মনে হলো স্যারের তো কোনো মেয়ে নেই, তাই আমাকে মেয়ে ভেবে একটু আদর করলেন।

এরপর আরো অন্যান্য স্যারের কাছে পড়েছি। কিন্তু তারা কেউ এমন করেননি। জানি না তারা আমাকে মেয়ের মতো দেখতেন কি না।

এবার আসি আমার ভালো লাগা এবং ভালোবাসার কথায়। আমি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা দিচ্ছি। একদিন এক স্যার এলেন গার্ড দিতে। দেখতে খুব স্মার্ট এবং সুন্দর। স্যার আসার পর সব মেয়েরা স্যারকে দেখতে লাগলো।

একজন তো স্যারকে ডেকে বলেই ফেললো, স্যার, আপনি খুব সুন্দর।

স্যার ভীষণ লজ্জা পেল।

সেই স্যারকে আমারও ভালো লেগেছিল এবং সেটাই আমার জীবনের প্রথম ভালো লাগা। তারপর অনেক দিন আর কাউকে ভালো লাগেনি।

যখন কলেজে ভর্তি হই তখন একটি ছেলেকে খুব ভালোলেগেছিল ভালোবাসাও তৈরি হলো মনের মধ্যে। তবে প্রথমে সেই আমাকে পছন্দ করে। এ কথা বান্ধবীদের মুখে শুনেছিলাম।

আমার ভালোবাসার মানুষটি আমাদের ক্লাসে এবং একই ডিপার্টমেন্টে পড়তো। ফলে ক্লাসে সব সময় তার প্রতি দৃষ্টি রাখতাম। সে কি করছে, কিভাবে কথা বলছে, কেমন করে পড়া শুনছে ইত্যাদি সব কিছু আড়চোখে দেখতাম।

কিন্তু সে কখনো আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতো না। বিশেষ দরকার ছাড়া সে আমার সঙ্গে কথাও বলতো না। অথচ আমি তার জন্য পাগল প্রায়।

তার সব কিছু আমার ভালো লাগতো। তার মাথায় অনেক চুল ছিল যা লক্ষ্য করতাম। তার ভ্রূ দুটি আমাকে খুব আকৃষ্ট করতো। কল্পনায় ভাবতাম সে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে আর আমি তার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছি। তাকে এতো ভালোবাসি কোনোদিন প্রকাশ করতে পারিনি। নীরবে মনের মধ্যে সুপ্ত ভালোবাসার কথা কাউকে জানতে দিইনি। যদি প্রত্যাখ্যাত হই তাহলে সইতে পারবো না। তাই এটাই ভালো, মনে মনে ভালোবেসে যাবো।

তাকে এতো ভালোবাসতাম যে, কলেজ থেকে বাড়ি এলে মন খারাপ হয়ে যেতো। বিছানায় শুলে শুধু তার কথাই মনে পড়তো। কতো রাত তার কথা ভেবে নির্ঘুম রজনী কাটিয়েছি, তাকে একদিন না দেখে থাকতে পারতাম না। তাই প্রতিদিন কলেজে যেতাম ক্লাস না থাকলেও শুধু তাকে এক নজর দেখার জন্য।

কলেজের অনেক অনুষ্ঠানে শুধু তাকেই দেখতাম প্রফুল্ল চিত্তে। বিশেষ বিশেষ দিনে তাকে উইশ করে চমকে দেবো ভাবলেও ভয়ে তা কোনোদিন করতে পারিনি। তাকে ভালোবাসি এটা সে কখনোই জানতে পারেনি। আর পারলেও কি করতো জানি না। এটাই আমার প্রথম ভালোবাসা। আজও তাকে ভালোবাসি।

মনের কথা, মুখে শুধু বলি না। তাই আজ এই ভালোবাসা দিবসে আমার না বলা কথাগুলো জানিয়ে দিলাম তাকে।

আমার প্রথম ভালোবাসা, তুমি ১৪ ফেব্রুয়ারির ভালোবাসা দিবসে শুভেচ্ছা গ্রহণ করো।

চুয়াডাঙ্গা থেকে

পত্রমিতালি

– এসএম শওকত

তখন বিএ পড়ি। সহপাঠী আজাদ পত্রমিতালি করে। সে আমাদের কাছে তার পত্রমিতার গল্প করে।

আমি পুলকিত হই। অনেক আগে থেকেই পত্রমিতালির প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল। ইদানীং আজাদের কাছে পত্রমিতালির গল্প শুনতে শুনতে পত্র মিতালির প্রতি আমার ঘুমন্ত আগ্রহটা জাগ্রত হয়ে ওঠে।

মেঘ না চাইতে বৃষ্টির মতো চট করে সাপ্তাহিক *মনোরমা* পত্রিকায় কয়েকটি ঠিকানা পেয়ে যাই। সীমান্ত এলাকার মেয়েদের প্রতি আমার কৌতূহল অসীম। তাই পঞ্চগড়ের তেতুলিয়া থানার একটি মেয়ের ঠিকানা আমার হৃদয়ে লিখে রাখি।

মার্চ ১৯৯৩-এ তাকে চিঠি লিখি। জবাবের অপেক্ষা করতে করতে আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিই ঠিক তখনই তার চিঠি পাই। বিচিত্র ধরনের এক আনন্দ অনুভব করতে থাকি যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

পরদিনই তাকে চিঠি লিখি। এর কয়েকদিন পর আবার তার চিঠি পাই। আবার আমি লিখি, আবার সে লেখে। আমি তাকে ভালোভাবে জানি। জেনে নিই তেতুলিয়ার অনেক না জানা কথা। সেও আমাকে জানে, জেনে নেয় আমাদের বরিশাল সম্বন্ধে।

আমার পত্রমিতার সুবিধার জন্য এখানে তার নাম প্রকাশ করতে চাই না। তবে আলোচনার জন্য তার একটি নাম দরকার। তাই তার নাম দিলাম মীরা।

এভাবে চিঠি লেন-দেনের মাধ্যমে আপনি থেকে তুমি এবং বন্ধুত্ব থেকে আমাদের সম্পর্ক এক সময় ভালোবাসায় রূপ নেয়। পরস্পরকে আমরা প্রচণ্ড ভালোবাসি। যেখানেই যাই, যেদিকে তাকাই সব সময় শুধু মীরার কথাই মনে পড়ে যেন শুধু মীরাকেই দেখতে পাই। মীরাকে যে কি পরিমাণ ভালোবাসি তা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। তবে শয়নে-স্বপনে, নিশিতে-জাগরণে কেবলই তার কথা মনে পড়ে।

প্রায়ই মনে একটা প্রশ্ন জাগে, লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ এদের ভালোবাসা কি আমাদের ভালোবাসার চেয়ে গভীর ছিল?

আমার দৃষ্টিভঙ্গি এমন ছিল যে, মীরা বোবা-কালা যাই হোক, যদি এমন হয় যে, মীরা একা একদিকে এবং সমস্ত দুনিয়া অপরদিকে তবুও মীরাকেই বেছে নেবো। এতো দিন এতো লেখালেখি, এতো ভালোবাসাবাসি, অথচ তাকে একটিবার দেখলাম না। তাই মীরাকে দেখার জন্য ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। মনে হচ্ছিল মীরাকে এক নজর দেখতে পেলে এ জীবনে আর কিছু চাই না। তাছাড়া মীরা আমার চিঠিগুলো পড়ে আমাকে ভালোবেসেছে। আমাকে দেখার পর তার যদি অপছন্দ হয়, তাই তার সঙ্গে দেখা করা অত্যন্ত জরুরি। যদিও মীরা তার ভুবন বিখ্যাত চিঠিগুলোতে একাধিকবার লিখেছে, আমি তোমার রূপ দেখে ভালোবাসিনি, ভালোবেসেছি তোমার সুন্দর মনটাকে তবুও তাকে দেখার আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চললো।

অবশেষে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪–তে রওনা দিলাম আমার মানসপ্রিয়ার উদ্দেশ্য। পঞ্চগড়ে পৌছালাম রাতে। ছিলাম হোটেল হিলটন–এ। পরদিন সকালে তেতুলিয়ার ভজনপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ভজনপুর বাসস্ট্যান্ডে নেমে হঠাৎ করেই প্রশ্নটা মনে এলো। প্রশ্নটা হলো, মীরাদের বাসাটা চিনবো কিভাবে? কাউকে তো জিজ্ঞাসা করে নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারি। হঠাৎ করে প্রশ্নটা যেভাবে মনে এসেছিল তেমনি হঠাৎ করেই উত্তরটা পেয়ে গেলাম।

আগে থেকেই জানতাম, ডাক পিওনের সঙ্গে মীরার ভালো সম্পর্ক আছে। পোস্ট অফিসটা ছিল বাসস্ট্যান্ডের সঙ্গেই। ডাক পিওনকে দিয়ে মীরাকে সংবাদ পাঠালাম।

সামান্য পরেই দেখলাম, পিওনের পেছনে দুটি মেয়ে আসছে। এর আগে ফটো দেখার সুবাদে চিনতে পারলাম দুজনের একজন মীরা। অপরজনকে চিনলাম না। কিছুটা দূর থেকে তাদেরকে দেখেই আপন দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিলাম এ জন্য যে, তারা যেন না বোঝে, আমি তাদের দেখেছি। একটু পরেই পেছন থেকে মেয়েলি কণ্ঠের ডাক এলো, আসুন।

তাদের দিকে তাকাতেই মীরা তার সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দিল। মেয়েটি তার ছোট বোন শেফু।

তারা আমাকে তাদের বাসায় যাওয়ার আহ্বান করলো।

রোমাঞ্চ, উত্তেজনা, শিহরণ, কেমন যেন বিচিত্র অনুভূতি। ঠোট দুটি দুরু দুরু কাপছে। যাকে একটিবার দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম, যাকে পাওয়ার জন্য অনন্ত নক্ষত্র বিথীর এই সুন্দর ধরনীকে ছাড়তে পারি, আমার সেই মানসপ্রিয়া আমারই সামনে দাড়িয়ে। কি করবো, কি বলবো বুঝে উঠতে পারছি না। আমি যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি।

বাসস্ট্যান্ডের মাঝে পোস্ট অফিসের সামনে দাড়িয়ে এতোটা ইতস্তত করা সমীচীন নয়। অন্তত একশ চোখ আমাদের দেখছে।

অবশেষে গেলাম মীরাদের বাসায়।

মীরা তার মা, বোনদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ পরে এলো চোদ্দ প্রকার হালকা খাবার। পাঠকদের কাছে পরিমাণটা বেশি মনে হওয়া অস্বাভাবিক না। আমিই এতো প্রকার খাবার দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা মীরার দুটি বোন শুরু থেকেই জানতো। তারা পিঠাপিঠি তিন বোন একেবারে বান্ধবীর মতো ফ্।

খাবারের পর তাদের তিন বোনকে নিয়ে গল্পে মেতে উঠলাম। এক পর্যায়ে বললাম, চলো, তোমাদের পাথর ওঠানো দেখবো।

ভজনপুরে (তেতুলিয়া) মাটির নিচে পাথর পাওয়া যায়।

মীরা তার মায়ের কাছে বলে আমাকে পাথর ওঠানো দেখাতে নিয়ে গেল।

দুজনে তাদের একটা জমিতে গেলাম। দেখলাম, কয়েকজন শ্রমিক দুই তিন হাত মাটি খুড়ে বালু ও পাথর তুলছে। অবাক কাণ্ড! সামান্য মাটির নিচে বালু ও বিভিন্ন সাইজের পাথর কোথা থেকে আসে কে জানে! তবে আমরা যেটা জানি তা হলো আমাদের এ সাক্ষাৎকে স্মরণীয় করে রাখতে হবে।

অনেকগুলো জমি পাড়ি দিয়ে দুজনে হাটতে হাটতে বাংলাদেশের প্রায় বর্ডারের কাছাকাছি এসে পড়েছি। কিছুটা দূরে কয়েকজন বিএসএফ–কে দেখতে পেলাম।

মীরা বললো, আর এগোনো ঠিক হবে না।

বসে পড়লাম একটি মেঠো পথের পাশে। চারদিকের জমিতে নানান ফসলের সমাহার। কোনো জমিতে আখ, কোনো জমিতে গম। ঝিরিঝিরি বাতাসে ক্ষেতের ফসলগুলো ছন্দাকারে দুলছে। সেই বাতাস আমাদেরকে মোলায়েম করে দিচ্ছে। এমন সুন্দর পরিবেশে আমরা মনের কথাগুলো উজাড় করে দিলাম পরস্পরকে।

এক সময় দূরে দেখলাম, মীরার ছোট বোন লাবনী আমাদেরকে পেছনে ফেলে বর্তমান স্পিকারের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা ধরেই নিলাম, সে আমাদেরকে খুজতে যাচ্ছে। তাকে ডাক দিলাম। তার কাছ থেকে জানলাম, বাড়িতে আমার লাঞ্চ রেডি করে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে। এতোক্ষণে ঘড়ি দেখার কথা মনে পড়লো। পৌনে চারটা। কোথা দিয়ে কখন যে বেলা বয়ে গেল টেরই পাইনি।

মোট কথা, তাদের বাড়িতে দুই দিন ছিলাম। অবশ্য মাঝখানের রাতটি বিশেষ কারণে হোটেলে ছিলাম। বলাবাহুল্য যে, প্রচুর আদর-যত্ন পেয়েছি। বিদায়বেলায় তারা কয়েকজন কিছুটা পথ এগিয়ে দিল।

তাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। চোখ ফেটে কান্না আসছে। কিছুতেই কান্না চাপিয়ে রাখতে পারছি না। ঝাপসা চোখে পেছন ফিরে তাদেরকে বিদায় জানাতে পারলাম না। বার বার মনে হচ্ছিল, এ জীবনে আমাদের আর দেখা হবে না।

মীরাকে জীবনসঙ্গী করতে পারিনি। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪-র পর আমাদের আর দেখা হয়নি। আজও তাকে ভুলিনি।

কাপ্তাই থেকে

সেই মেয়েটি

দেশ থেকে ফিরে এসে প্রায় চার মাস পর আবার কাজে যোগ দিলাম।

অনেক দিন পর দেখা।

সবাই ঘিরে ধরলো। দেশ কেমন লেগেছে, বিয়ে করিনি কেন? ইত্যাদি নানান জিজ্ঞাসা।

তাদের জন্য দেশ থেকে যা গিফট নিয়ে এসেছিলাম তা আগেই পৌছে গিয়েছিল তাদের হাতে।

সবাই ধন্যবাদ জানালো।

কাজ শুরু করবো আর তখনই চোখে পড়লো একটি মেয়ে মাথা নিচু করে কাজ করছে। স্লিম, ফর্শা, কালো চুলের মেয়েটি যখন মুখ তুলে তাকালো দেখলাম, অপূর্ব সুন্দরী, মিষ্টি একটি মেয়ে। কেউ কিছুই বললাম না। আমার কাজ করছি আর মনে মনে অপেক্ষা করছি কখন সুযোগ হবে, কখন তার সঙ্গে পরিচিত হবো। খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি।

দুজন পাশাপাশি কাজ করছি। জানতে চাইলাম, কি নাম তোমার?

জুলিয়া। নিজের নাম বললো। সম্পূর্ণ পরিচয় দিল। আমার পরিচয়টাও জেনে নিল নিজেই।

এতো সুন্দর করে কথা বলে মেয়েটি, খুব আপন মনে হয়। মেয়েটির মুখের দিকে তাকালে এতো সুন্দর মনে হয় শুধুই চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সরু বাহু, চওড়া কাধ, খোলা পেট, উল্কি আকা উন্মুক্ত কোমর এবং টান টান শরীর, এর সব কিছু থেকেই যেন সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ছে। কথাগুলো যেন হৃদয় ছুয়ে যায়। মেয়েটি যখন হাসে যেন চারপাশ হেসে ওঠে। অবাক হয়ে ভাবি, কারো হাসি এতো সুন্দর হয়!

আমাদের সঙ্গে জুলিয়া কাজ করবে সামার ভেকেশনের দুই মাস। জুলাই ও আগস্ট। তারপর পড়াশোনা আর করবে না, নতুন একটি কাজ খুজে নেবে।

খুব অল্প সময়েই জুলিয়া আমার খুব আপন হয়ে গেল। আমরা দুজনেই দুজনার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেলাম। আমি হাসলে সেও হাসে। প্রচণ্ড গরম বলে কিছুক্ষণ পর পরই পানি এনে দেয় পাশে রাখা ফিল্টার থেকে।

আমি আনতে গেলেই সে রাগ করবে।

কাছাকাছি, পাশাপাশি কাজ করার ফাকে ফাকে আমার সম্বন্ধে জেনে নেয় অনেক কিছুই। বিয়ে করিনি এবং বান্ধবী নেই জেনে নিয়েছে আগেই। ছুটির দিন কিভাবে কাটাই? কেন বান্ধবী খুজে নিই না? এমনই সব প্রশ্ন করবে।

বলতো চুলের স্টাইল চেঞ্জ করতে, জেল দিতে। নাহলে সে রাগ করবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই, সাইকেলে চড়ে কাজে আসি। তাতে তার খুব মন খারাপ হয়। প্রতিদিন বাড়ি ফেরার সময় সে তার বাবার জন্য অপেক্ষা করতো তাদের গাড়ির সামনে দাড়িয়ে। আমাকেও বিদায় জানাতো হাত নেড়ে। এবং সেই অসাধারণ সুন্দর হাসি। এমনই বিশেষত্বপূর্ণ ছিল প্রতিটি দিন।

একদিন আমার কাছে জুলিয়া জানতে চাইলো শনিবার বিকেলে তাকে সময় দিতে পারবো কি না।

চুপ করে এড়িয়ে গিয়েছি। মনে মনে ভাবছি, আমাদের এ দুর্বলতার বিষয়টি অনেকেই বুঝতে পেরেছে। কেউ সেটা ভালোভাবে নিচ্ছে না। ইটালিয়ান কৃশ্চিয়ান একটি মেয়ে গরিব বিদেশি একটি ছেলেকে ভালোবাসবে, এ বিষয়টি তারা মেনে নিতে পারছে না। উচু-নিচু আর ধর্মীয় ভেদাভেদ। কাজ হারানোর ভয় হলো। সে মুহূর্তে কাজ চলে যাওয়া এবং মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া এক সমান আমার কাছে। তারপর আছে আমার পরিবার, সংস্কৃতি, ধর্ম, দেশ। ও অন্যদিকে ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন ধর্মের বিদেশিনী একটি মেয়ে।

এরা আজ ভালোবাসার জন্য সব কিছুই করতে পারে। আবার কাল সে একই ভালোবাসার কোনো দাম নেই। ভালো না লাগলেই পরিবর্তন করবে ভালোবাসার মানুষটিকে। কাউকে ভালো লাগলে আর ইচ্ছে হলেই সেক্স করবে তার সঙ্গে। এখানে অবাধ সেক্স বৈধ।

হিসাব করছি। কিন্তু হিসাব তো মেলে না। ভেতরটায় ভেঙে-চুরে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। বড় ভালোবেসে ফেলেছি মেয়েটিকে।

আবার জানতে চাইলো আমার সময় হবে কি না?

খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বললাম, ছুটির দিনটিতে ঘরে মা, ভাইদের আর ছোট্ট বোনটিকে সময় দিতে হবে।

খুব রাগ করলো। আমাকে উপদেশ দিল, পুরুষের পাশে নারী না থাকলে পুরুষকে পুরুষ বলা যায় না। পাশে নারী থাকলে পুরুষ উষ্ণতা পায়, আদর-সোহাগ পায়। বললো, আমিও আমার পাশে একজন পুরুষ থাকবে এটাই পছন্দ করি।

বুকের ভেতরে কষ্ট আর বাইরে খোটাটাকে হজম করার চেষ্টায় কাজে মনোযোগ দিই।

সময়গুলো কেটে গেল।

যাবার একদিন আগে জুলিয়া বলেছিল, জানো তো, আমাকে খুজলে পাবে।

উত্তরে কিছুই বলিনি।

সে আবারও বললো, তোমার সঙ্গে কি দেখা হবে!

কিছু একটা বলতে হয়। তাই বললাম, হয়তো পাবে এখানেই।

জুলিয়া চলে যাবার দিন ইচ্ছে করেই কাজে যাইনি। ভয় হয়েছে যদি দুজনের কেউ একজন আবেগকে সামলাতে না পারি!

পরদিন কাজে গিয়েছি। যেদিকে তাকাই, সবখানেই ফাকা লাগে। বুকের ভেতরটাও কেমন শূন্য শূন্য লাগছে।

কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে আজ আর কেউ দাড়িয়ে নেই। কষ্টে বুক ফেটে যায় আমার। কান্না কিছুতেই চাপিয়ে রাখতে পারি না।

পথে পথে সাইকেলে চড়ে ঘুরলাম কিছুক্ষণ। কাদলাম। বাড়ি ফিরতে আর মন চায় না যেন। যেন ভেতর থেকে আমি আশ্রয়হীন হয়ে গেছি।

পনের দিন কেটে গেল।

আজ জুলিয়ার কথা বেশিই মনে পড়ছিল। সারা দিন মনমরা ভাব নিয়ে কাজ করে যাই। কাজ শেষে বাইরে এসে দেখি জুলিয়া কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। বিশ্বাস হয় না নিজের চোখকে। বুকের ভেতর হার্ট বিট বেড়ে যায় আমার।

কাছে এসে *চা'ও* (শুভেচ্ছা সম্বোধন) বলতেই জুলিয়া দৌড়ে আমার কাছে চলে আসে। একেবারে বুকের কাছে। গাল বাড়িয়ে দেয় চুমু দিতে।

আমি দিই, সেও দেয়।

তারপর জানতে চায় সব। তাকে মিস করি কি না। কষ্ট হয় কি না আমার।

বললাম, তোমাকে ছাড়া ভালো নেই।

বললো, আমাদের আবার দেখা হবে। আমি আরো আসবো।

বিদায় নিই। ভীষণ কষ্ট গোপন করার অবিরাম চেষ্টা চলে ভেতরে ভেতরে।

ডিসেম্বর মাস। ৪ তরিখ। জুলিয়ার জন্মদিন। অনেক দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে জুলিয়াকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে মেসেজ পাঠাই। বলি, তোমাকে মনে পড়ে সব সময়। ভুলে যেও না আমায়।

সামান্যতম দেরি না করেই সে উত্তর পাঠায়। অনেক ধন্যবাদ। কখনো ভুলবো না তোমাকে। অনেক অনেক চুমু।

অপূর্ব এক ভালোবাসার অনুভূতি আমার শিরায় অনুভব করি। ভালোবাসার অনেক সুখ, ধর্ম, সংস্কৃতি, পরিবার, দেশ আবারও হিসাব করতে বসি। মধ্যবিত্ত জীবনের মানসিকতা, পারিবারিক বন্ধন - হিসাব তো মেলে না!

প্রতিটি ছেলের মনেই একটি মেয়ে, একটি আদর্শ নারীর ছবি আকা থাকে। হয়তো মেয়েদের ক্ষেত্রেও তা-ই। সবাই সেই আকা ছবিটিকে খুজে বেড়ায়। আমি পেয়েছি। জুলিয়া, আমার মনের মধ্যে আকা সেই মেয়েটি। জুলিয়াকে আমার বড় ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, আজন্ম সাধ যে আমার ভালেবাসার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ভিসেন্সা, ইটালি থেকে

হাসি

- মাসুম

বেশি দিনের কথা নয়। এইতো সেদিন ২০০৪ সাল। আমাদের নারায়ণগঞ্জের শহীদ জিয়া হলে প্রতি বছরই বিশ দিনব্যাপী *বিজয় মেলা* হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

আমরা দুই বন্ধু গিয়েছিলাম সেই বিজয় মেলাতে। মেলার প্রতিটি স্টল আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। আমরা যখন একটা স্টলে গেঞ্জি দেখছিলাম, সেখান থেকে তার দূরে একটি স্টলে তাকাতেই দেখতে পেলাম একটি অষ্টাদশী সুদর্শনা মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে যেন হেসে কথা বলছে। তার এ রকম মুক্তা ঝরা হাসি দেখে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম অন্য জগতে। তার হাসির মাঝে বাধা পড়ে গেল আমার দৃষ্টি।

মেয়েটি যখন খেয়াল করলো আমি তাকিয়ে আছি তার দিকে তখন সে তার মোবাইল অফ করে গেঞ্জি ভাজ করতে শুরু করলো। মাঝে মধ্যে আমার দিকে তাকাচ্ছে। সে হয়তো বুঝতে পেরেছে আমার চোখের ভাষা। তখন স্থির করলাম, যেভাবেই হোক তার বন্ধু হতে হবে। তাই বুকে সাহস নিয়ে গেলাম এগিয়ে। স্টলে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

মেয়েটি বললো, ভাই, কিছু নেবেন?

আমার মুখে কোনো কথা নেই। কারণ আমি তো কিছু কিনতে আসিনি। আমি তার চোখ, মুখ, ঠোট অপলকভাবে দেখছি।

মেয়েটি আবার বললো, ভাই, কিছু নেবেন?

এবার বাস্তবে এলাম। বললাম, হ্যা নেবো। ফুল হাতা শর্ট গেঞ্জি।

মেয়েটি বললো, আছে।

তারপর সে বিভিন্ন রকমের গেঞ্জি আমাকে দেখাতে লাগলো।

তার সঙ্গে বেশি সময় কথা বলার জন্য বললাম, ভালো গেঞ্জি নেই?

সে এক এক করে আরো গেঞ্জি দেখালো।

আমি বললাম, গেঞ্জি পছন্দ হয়নি।

আমার গেঞ্জি পছন্দ না হওয়াতে মেয়েটি বললো, আপনি কেমন গেঞ্জি চান?

বললাম, ম্যাডাম, আমি একটি গেঞ্জি এনেছি, দেখাবো।

দেখান।

তারপর অন্য স্টল থেকে কেনা গেঞ্জিটা তাকে দেখালাম।

মেয়েটি আমার গেঞ্জি দেখে বললো, এটা তো বাচ্চাদের গেঞ্জি। তার সঙ্গে থাকা একটি বাচ্চাকে দেখিয়ে আরো বললো, দেখছেন না আমার বাচ্চাই তো পরেছে।

তার কথা শুনে আকাশ যেন আমার মাথায় পড়লো। কারণ ভেবেছিলাম মেয়েটি অবিবাহিত। কিন্তু এখন দেখছি সে এক সন্তানের জননী। পরে ভাবলাম, তাতে কি হয়েছে? তাকে তো আমার বন্ধু বানাতে চেয়েছি। আর তো কিছু নয়। তাই বললাম, ম্যাডাম, এটা আপনার সন্তান?

মেয়েটি বললো, হ্যা।

তারপর মেয়েটির সঙ্গে অনেক বিষয় আলাপ হলো। আলাপের মাধ্যমে জানতে পারলাম তার স্বামী গেঞ্জি ইমপোর্টের ব্যবসা করে।

আলাপ শেষে যখন বাসায় ফিরবো তখন মেয়েটি বললো, আপনি যদি ভালো গেঞ্জি নিতে চান তাহলে তিন দিন পরে আসবেন।

ম্যাডাম, আমার আসতে অনেক টাকা খরচ হয়।

আপনি জামতলায় থাকেন না?

আপনি কি করে জানেন আমি জামতলায় থাকি?

মনে হয় আপনাকে জামতলায় দেখেছি।

পরে বাসায় ফেরার সময় মেয়েটি বললো, আবার কবে আসবেন?

এক সপ্তাহ পর।

আমার তখন কিছুতেই আসতে মন চাইছিল না। ভাবলাম, কিভাবে তার মোবাইল নাম্বারটা নেয়া যায়! তাই আবার মেয়েটির স্টলে গিয়ে মেয়ের সঙ্গে থাকা একটি লোককে বললাম, ভাই, আসতে তো অনেক টাকা খরচ হয়, যদি আপনাদের কোনো ফোন নাম্বারটা আমাকে দিতেন।

আমার কথা শুনে লোকটি বললো, না। ফোন নাম্বার দেয়া যাবে না।

দেখলাম মেয়েটি নিচের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

আমি বোকা হয়ে গেলাম।

তার স্টল থেকে এসে মেইন গেইটে দাড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ পর দেখলাম মেয়েটি তার বান্ধবীকে নিয়ে মেইন গেইটের দিকে আসছে।

এগিয়ে বললাম, ম্যাডাম, এক মিনিট।

মেয়েটি বললো, কি?

ম্যাডাম, আমি ফোন নাম্বার চাওয়াতে ভাই মনে হয় মাইন্ড করেছেন।

না, কোনো সমস্যা নেই।

তারপর বাসায় চলে এলাম। কিন্তু কিছুতেই তার হাসির কথা ভুলতে পারছি না।

এক সপ্তাহ পর আবার গেলাম মেলায়। তার সামনের স্টলে গেঞ্জি দেখছি। হঠাৎ তার স্টলে তাকাতেই দেখতে পেলাম সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

তার কাছে গিয়ে বললাম, ম্যাডাম, কেমন আছেন?

ভালো আছি।

ম্যাডাম, ভালো গেঞ্জি কি এনেছেন?

এনেছি। এই বলে সে বিভিন্ন গেঞ্জি আমাকে দেখাতে লাগলো।

আবার আমার সেই একই কথা, গেঞ্জি পছন্দ হয়নি। তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় আলাপ হলো। কিন্তু তার সঙ্গে কিছু ছেলে থাকাতে তার কাছে মোবাইল নাম্বারটা চাইতে সাহস পাচ্ছিলাম না। তারপরও সাহস করে বললাম, ম্যাডাম, একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো।

বলুন কি কথা?

না, থাক। আরেকদিন এসে বলবো।

না। আপনি কথা না বলে যেতে পারবেন না। এখনই বলে যেতে হবে।

বললাম, আপনি কি খানপুর থাকেন?

হ্যা। আমি খানপুর ব্যাংক কলোনিতে থাকি।

ম্যাডাম, আরেকটি কথা বললো।

বলুন।

ম্যাডাম, আপনার হাসিটা একসেলেন্ট।

দেখলাম মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। সামলে নিয়ে বললো, থ্যাংক ইউ।

শুধুই থ্যাক ইউ?

আপনাকে মেনি মেনি থ্যাংকস।

আবার কবে আসবেন?

১৬ ডিসেম্বর।

বাসায় চলে এলাম।

আবার ১৬ ডিসেম্বরে গেলাম। গিয়ে দেখি মেয়েটি স্টলে নেই। আর তখন বুকে চিন চিন ব্যথা শুরু হলো। তাকে না পাওয়াতে মেলার মেইন গেটে দাড়িয়ে আছি। হঠাৎ সামনে তাকাতে দেখলাম সেই মেয়েটি তার বান্ধবীকে নিয়ে রিকশা দিয়ে যাচ্ছে।

আমাকে দূর থেকে দেখে সেই সুন্দর হাসি দিয়ে চলে গেল।

এক ঘন্টা অপেক্ষা করে বুঝতে পারলাম মেয়েটি আর আসবে না।

বাসায় চলে এলাম।

তাকে দেখার আশায় চার দিন পর আবার গেলাম। এবারও গিয়ে তাকে পেলাম না।

ধর্মগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থেকে

সবই ভুল

মানুষ কাদে কেনো?

কাদলে কি ব্যথা ভোলা যায়?

ভালোবাসা জানি না। জানতে পারবো কি? আচ্ছা, কাকে ভালোবাসবো? যাকে সত্যিকারে ভালোবাসা যায়, সে অতি অপমান, আঘাত করলে, হাজার ব্যথা দিলেও তাকে ভোলা যায় না।

হয়তো ভালো আছো। হয়তো খারাপ আছো। ঠিক বলতে পারছি না। আমি খুব ভালো আছি। কারণ আমার মতো মেয়েরা কখনো খারাপ থাকে না। আমরা সব সময় ভালোই থাকি। কিন্তু আমাদের আশপাশের মানুষরা আমাদের জন্যই খারাপ থাকে। আমার জীবনটা কখনো ঠিকমতো চলে না। কোথাও না কোথাও গণ্ডগোল হবেই। আর আমরা মেয়েরা সারা জীবন শুধু অন্যের ইচ্ছামতো চলতেই দিন পার করে দিই। যেখানেই যাই না কেন, ছোট হয়ে থাকতে হবেই। কি করবো বলো, এটা তো কারো দোষ না। খোদাই যখন আমাদের সব দিক দিয়ে ছোট করে তৈরি করেছেন তখন তো ছোট হয়ে থাকতেই হবে। কোথাও আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

এই পৃথিবীতে বাবা-মা প্রতিটি মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় হয়। তারপরে অন্য কারো স্থান থাকে। আমার কাছে সেই স্থানটা তোমার। তোমাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি এবং বিশ্বাস করি। সেই তুমি এ রকম করবে স্বপ্নেও ভাবিনি।

তুমি সব সময় বলতে আমি তোমার নদীতে ভেসে থাকা খড়কুটো।

এই কি তার নমুনা! তুমি তো আমার মতোই ছিলে। হঠাৎ সবার কথায় আমাকে ভুল বুঝলে। তোমার-আমার মধ্যে যা হয়েছে, তৃতীয় ব্যক্তিদের সংখ্যাই বেশি ছিল। মানুষ এতো সাহস পায় কি করে? এটাই তো সুইয়ের ফুটো। এটা দিয়েই তো মানুষ ভেতরে আসার সাহস পায়। আমি সমস্যাটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝিনি। শুধু বুঝেছি সমস্যাটা খুব বড়। আর তুমি তাদের কথাই শুনলে।

কিন্তু এমন কথা ছিল না কথা ছিল আমরা দুজন ঠিক থাকবো সব বিপদে। আমি ঠিক ছিলাম তুমি ঠিক থাকোনি। তুমি বলতে, আমি নাকি ভালোবাসার ভালো রূপ দেখিনি। তাই ভালোবাসার বিপক্ষে কথা বলতাম।

ভালোবাসার কি এই ভালো রূপ দেখালে! আজ খুব দুঃখ পেয়েছি। আজ জানলাম, যাকে খুব বিশ্বাস করতাম সে আমায় দুঃখ দিল। কি জানি কেন? আচ্ছা, আমি কি সত্যই কারো বিশ্বাসের যোগ্য নই? যাকে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করি সেই কেন যেন আমায় ধোকা দেয়। যার কথা বিশ্বাস করলাম, জানলাম, সেও সবার মতো আমাকে নিয়ে খেলছে।

আজ সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ভবিষ্যতে কাউকে কোনো কারণে সামান্যতম বিশ্বাস করবো না। কারণ বিশ্বাস করলেই ঠকি। আজ খুব কাদতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কি সত্যই কাদতে ভুলে গেছি? সামান্যতম পানি চোখ থেকে বের হলো না। আসলে বেশি পরিমাণ দুঃখ পেলে কান্না যায় না। কাদতে খুব ইচ্ছ করছে।

আমি এক অতল সাগরে ভেসে যাওয়া নৌকা যার কোনো দাড় নেই, নেই কোনো মাঝি। এ নৌকা কোথায় যাবে কেউ জানে না। জানতে চাইবেও না। এ হচ্ছে মানুষেরই রূপ।

কাউকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে। কাকে লিখবো। কেউ কি আছে যাকে খুব সুন্দর করে চিঠি লেখা যায়? মনে মনে কাউকে খুব পছন্দ করি। আসলে কথাটি কি ঠিক ঠিক আছে। যাকে পছন্দ করি তাকেই চিঠি দিই! কিন্তু কি লিখবো। আমি তো আবার চিঠি লিখতে পারি না।

হয়তো এই চিঠি তুমি পড়বে না। লিখছি যে তাও জানো না। লিখলাম। কারণ এটা তোমাকে লেখা আমার প্রথম এবং শেষ চিঠি যা তোমাকে না পাঠিয়ে পাঠালাম পত্রিকায় ছাপানোর জন্য। সব পাঠক পাঠিকা পড়বে আমার লেখা।

এই গ্রহে যতো ফুল ফুটবে সব তোমার জন্য। আগামী দিনগুলোতে ভালো থেকো, সুখে থেকো। আজ ভালোবাসার দিবসে তোমায় জানাই লাল গোলাপের শুভেচ্ছা। পৃথিবীতে অনেক কথা আছে যা কাউকে বলা যায় না, যা লেখা যায় না। যা শুধু মনের অতি গভীরে রয়ে যায়। এ কি সারা জীবন মনের গভীরে থেকে যাবে। নাকি ভবিষ্যতের নানান কাজে, নানান ব্যস্ততার মাঝে হারিয়ে যাবে।

আমার কেন জানি মনে হয়, এ আমার মনের গভীরে রয়ে যাবে। ভবিষ্যতের শত ব্যবস্ততার মাঝে হারিয়ে যাবে না। এমন কোনো কথা কি আসলেই আমার মনের মধ্যে আছে, নাকি নেই ?

ভুল, সব-ই ভুল। জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা সব-ই ভুল, সব-ই ভুল।

যতোটা মেঘ হলে বৃষ্টি হবে
ততোটা মেঘ রেখেছি জমা
এই বুঝে তুমি আমায়
কাদাবে বলে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
দিনাজপুর থেকে

আব্বু

- নুসরাত জাহান নূপুর

আমার আব্বু আমার প্রিয় ও ভালোবাসার মানুষ। আমার আব্বুও আমাদের দুই বোনকে খুব ভালোবাসেন।

আমার আব্বু খুব আত্মভোলা টাইপের মানুষ। তিনি এতো আত্মভোলা টাইপের হয়েও কোর্টে এতো বড় বড় কেস মামলায় জিতে যান কিভাবে সেটা ভেবে আমি ও মেরিআপু অবাক হয়ে যাই। আব্বুকে মেরিআপু জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি এ রকম হলেও শক্ত শক্ত কেস নিয়ে মক্কেলরা আসে কেন?

তখন আব্বু উত্তরে বলেছিলেন, সবই খোদাতাআলার ইচ্ছা রে মা!

আব্বুর জন্য খারাপ লাগে আমার। আমি জানি মেয়ে হয়ে জন্মেছি যখন তখন একদিন না একদিন পরের ঘরে যেতেই হবে। সে সময়টার কথা ভাবি। আমার আব্বু তখন কি করবেন? কারণ কোর্টে যাবার সময় আব্বুর চশমা, কলম, ডায়রি আমাদের দুই বোনের একজনকে খুজে দিতে হয়।

আব্বু বলেন, এই সমস্যার জন্য চশমার সঙ্গে সুতো বেধে রাখবেন।

আমরা দুজনেই আব্বুকে বলি আমরা যতোদিন আছি ততোদিন সুতো বাধা লাগবে না, আমরা দুবোনই খুজে এনে দেবো।

আম্মুর কাছে শুনেছি, আমার বড় বোনের পর আমি যখন জন্মেছি তখন ডাক্তার বলেছিলেন, অ্যাডভোকেট মেয়ে হয়েছে। তাই বলে কি মন খারাপ লাগছে?

আব্বু এর উত্তরে বলেছিলেন, ছেলেমেয়ে দুটোই আল্লাহর দান। আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছে তাতেই আমি খুশি।

সত্যিই আমার আব্বুর কোনো তুলনা হয় না। ছোট বেলা থেকে আজ পর্যন্ত আব্বুকে যতো দেখছি ততোই মুগ্ধ হচ্ছি। আচ্ছা, পৃথিবীর সব বাবারা কি আমার আব্বুর মতো!

আমি জানি, আমার এ লেখাটা আব্বু পড়বেন। আমার লেখালেখিতে আব্বু দারুণ উৎসাহ দেন। আমাদের দুই বোনকে আব্বু খুব বিশ্বাস করেন। আমাদের কোনো কাজেই তিনি বাধা দেন না।

আব্বু, দেখে নিও, তোমার দুই মেয়ে তোমার এ বিশ্বাসের অমর্যাদা কখনো করবে না। আর দোয়া করো, আমরা যেন তোমার আদর্শকে আকড়ে ধরে বেচে থাকতে পারি।

আমরা দুই বোন তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বরিশাল থেকে

বৌ দেখা

– রিপন পারভেজ

আমি দেখতে সুন্দর না হলেও ভদ্র, নম্র বলে সবাই আমাকে ভালো জানে। আমার এলাকার সবার ঘরের দরজা সব সময় আমার জন্য খোলা ছিল। আমিও সাবধানে চলাফেরা করতাম যাতে কোনো বদনাম না হয়।

আমাদের পাশের বাড়ির এক হিন্দু দম্পতি থাকতেন। তাদের দুই মেয়ে ছিল। ছোট মেয়ে মলি ও বড় মেয়ে তুলি আর একটা মাত্র ছেলে অথই। তাদের বাবা একটি স্বর্ণকারের দোকানে কাজ করতেন। মা কোনো কাজ না করে সংসার নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। মেয়ে দুটো সুন্দর দেখতে না হলেও তার মাকে দেখলে মনে হয় যেন ডানা কাটা পরী। আল্লাহর কাউকে যখন কিছু দিতে চায় তখন অপৃপণভাবেই দেয়।

ওই মহিলাকে বৌদি বলে ডাকা শুরু করলাম। আস্তে আস্তে বৌদিদের বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলাম। দুপুরবেলা বৌদির বাড়িতে যেতাম। কারণ এ সময় তুলি, মলি এবং তার বাবা বাড়িতে থাকতেন না।

প্রথম প্রথম বৌদি একটু সংকোচ করতেন। বৌদির সঙ্গে প্রতিদিন যখন গল্প বা বিভিন্ন আলাপ করতাম, বৌদি একনাগাড়ে আমার দিকে চেয়ে থাকতেন। আমার মনে হতো তিনি আমাকে কিছু বলতে চান। কিন্তু কেন জানি বলছেন না।

পূজায় বৌদি আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন। এবং তাদের বাসায় যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেলাম।

সময় মতো বৌদিদের বাড়িতে গেলাম। একমাত্র বৌদিকে ছাড়া বাড়িতে কাউকে না দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা কোথায়?

বৌদি বললেন, ওরা সবাই হলে গেছে সিনেমা দেখতে। এ জন্যই তোমাকে এ সময় আসতে বলেছি।

বৌদি নীল শাড়ি ও পাতলা একটা ব্লাউজ পরেছে যাতে শরীর দেখা যায়। বৌদিকে অপূর্ব সুন্দর লাগছে। বৌদি এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন মনে হয় আমাকে গিলে খাবেন।

দুষ্টুমি করে বৌদিকে বললাম, আমার দিকে না তাকিয়ে একটু নিজেকে দেখুন, কতো সুন্দর লাগছে আপনাকে।

বৌদি দুষ্টু হাসি দিয়ে বললেন, তুমি সৌন্দর্যের কি দেখেছো? আসল সুন্দর তো এখনো দেখোনি। বিয়ে করো, তখন প্রাণ খুলে সৌন্দর্য দেখতে পারবে।

বললাম, আমি তো এখনো ছাত্র। তাছাড়া বেকার আমাকে বিয়ে করবে কে আর বৌ পাবো কোথায়?

বৌ পাওয়ার যদি ইচ্ছা থাকে হাত বাড়ালেই বৌ পেতে পারো।

বিদায় নিয়ে আসার সময় বৌদি আরো বললেন, আমার বাড়িতে যেদিন কেউ থাকবে না সেদিন যদি তুমি আমার বাড়িতে আসতে পারো তখনই তোমাকে বৌ দেখাবো।

ওই দিন তাদের বাড়ি থেকে আসার সময় বৌদি কানে কানে বললেন, আগামী সোমবার রাত দশটায় আমার বাড়িতে এসো। কেউ থাকবে না বাসায়। সারা রাত গল্প করবো এবং তোমাকে বৌ দেখাবো।

সোমবারের অপেক্ষায় থাকলাম। অজানা সুখের আশায় সোমবার রাতে বৌদির বাড়িতে বৌ দেখতে গেলাম। দরজা নক করার সঙ্গে সঙ্গে বৌদি দরজা খুলে দিয়ে বসতে বললেন। ডিম লাইটে আলোতে দুজন পাশাপাশি বসে গল্প শুরু করলাম।

আমার হাতের আংটিটি নাকি সুন্দর এই বলে তিনি আমার হাত স্পর্শ করলেন। তারপর এক সময় আমার হাত তার বুকে চেপে ধরতেই নিজের হাত টান দিয়ে বললাম, একি করছেন আপনি, প্লিজ! নিজের মানসম্মানের কথা চিন্তা করে তাকে অনেক বোঝালাম দুর্ঘটনা না ঘটানোর জন্য।

এরই মাঝে হঠাৎ ডিম লাইট বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, তুমি না বৌ দেখতে চেয়েছিলে? আজ প্রাণ খুলে সারা রাত দেখতে পারো।

সেই রাতে বৌদি আমার কোনো কথাই শুনলেন না। উল্টো আমাকে ভয় দেখিয়ে বললেন, আমি যদি এখন চিৎকার করে মানুষ ডাকি তাহলে তোমার মানসম্মান কোথায় থাকবে?

তারপর সারা রাত দুজন এক সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘুমিয়েছিলাম।

দেহহাটা, সাতক্ষীরা থেকে

Blood Oleander

সেই সকাল থেকে বার বার ট্রাই করছি। বার বার একই উত্তর, নাম্বার ডিসকানেকটেড হয়ে গেছে। অস্থির আর ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। অথচ ২৮ তারিখ তোমার বার্থডে। সেদিন তোমায় উইশ করেছিলাম। আসলে সবই আমার ব্যাড লাক। আজ মনে পড়েছে সেদিনটার কথা যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম। তারিখটা ছিল ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০২।

সবেমাত্র কলেজে ছুটি হয়েছে। কলেজ বিল্ডিং থেকে হেটে গেটের সামনে আসতেই তোমাকে দেখলাম। প্রথম দেখেই যে তোমাকে ভালোবেসেছিলাম তা নয়। তবে তোমাকে প্রচণ্ড ভালো লেগেছিল।

তুমি একাই এসেছিলে। সন্ধ্যা হতেই কলেজটা ফাকা হতে শুরু করলো। এক সময় তুমি আর আমি। শুধুই আমরা দুজন।

তুমি আমার কাছে এলে। বললে, ভাইয়া, ক্লাস থ্-র ছুটি হয়েছে?

বললাম, জি।

তুমি বললে, আমার ছোট ভাই থ্-তে পড়ে। আজ আম্মু আসার কথা ছিল। কিন্তু আমি এসেছি। তাকে তো কোথাও পাচ্ছি না।

তোমার ভাইয়ের নাম জানতে চাওয়ায় উত্তর দিয়েছিলে, নিলয়।

তুমি দোকান থেকে বাসায় ফোন করলে। তখনো আমি তোমার সঙ্গে।

এরপর তুমি চলে গেলে। ভালো লাগাটা রয়েই গেল। আস্তে আস্তে তা রূপ নিল ভালোবাসার।

তোমাকে খুজতে গিয়ে অনেক মজার এবং তিক্ত ঘটনা ঘটেছে। তা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। তোমার ফোন নাম্বার পেয়েছিলাম তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে। রেগুলার মিসকল দেয়া একটা রুটিনে পরিণত হয়েছিল। যদিও এখন পর্যন্ত তা চলছে এবং চলবে। দিনে একবারই মিসকল দিই যাতে বিরক্ত না হও। তবে

বিশেষ দিনে গুণে গুণে আটটা। কারণ এর মানে হচ্ছে আট অক্ষরের ইংরেজি বাক্য I Love You, আই লাভ ইউ।

ছেলেমানুষি, তাই না?

তুমি মাঝে মধ্যে ফোন করলে ফোনটা ধরে চুপ করে বসে থাকি এবং তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভবের চেষ্টা চালাই।

তুমি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ো। আর আমি সবেমাত্র ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলাম। পার্থক্যটা খুব বেশি না হলেও জানি যে, আমাদের বন্ধুত্ব সম্ভব। কারণ আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি। একদিন তুমি আমারই হবে। বোঝো এঞ্জেলিকা?

এঞ্জেলিকা তোমার আসল নাম নয়। শুধু তোমার কথা ভেবেই আসল নাম লিখলাম না। তবে তুমি যাতে বুঝতে পারো সে জন্যই বলছি, রবীন্দ্রনাথ হয়তো কোনো একদিন তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। এ জন্যই তোমার নামে তার নাটকের নাম দিয়েছিলেন। তোমার নামটা যে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায় এটাও হয়তো জানতেন।

আমার কাজিন আমাকে বলে, আমি তোমার জন্য যা অনুভব করি তা ভালোবাসা নয়। এটা একটা আকর্ষণ মাত্র এবং তোমাকে ভুলে যাওয়া উচিত।

তাকে বলি, এঞ্জেলিকা তো একটাই।

আচ্ছা, তুমি বলো, একটা ছেলে একটা মেয়েকে দুই বছর আগে একবারই দেখেছে। এরপর আর কোনোদিন দেখা হয়নি। ছেলেটা মেয়েটার জন্য যখন হৃদয় থেকে ভালোবাসা অনুভব করে এবং আশপাশের লোকজন যখন মানতেই নারাজ যে, It's love, true love তখন কেমন লাগে? জানি না এ জীবনে তোমায় পাবো কি না। তবে সৃষ্টিকর্তার কাছে একটাই অনুরোধ, মৃত্যুর পর যেন তুমি আমার হও। সে মৃত্যুও সার্থক এবং আনন্দের যার বিনিময়ে তোমায় পাওয়া যায়।

তুমি হয়তো কখনো জানবেও না যে, পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে কেউ একজন তোমাকে এতো ভালোবাসে। যেহেতু তুমি জানবে না সেহেতু উপলব্ধিও করতে পারবো না এর গভীরতা। হয়তো সারা জীবন একাই থেকে যাবো। ভোরের এক বিন্দু শিশির কণার সমান ভালোবাসাও হয়তো পাবো না। তবুও তুমি জেনে রেখো, আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি, ভালোবেসে যাবো।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে
blueorched@yahoo.com

শিউলি

- অরণ্য হাসান

বিদেশে চাকরির কারণে পরিচিত গ্রামটি আজ অপরিচিত হয়েছে। যে গ্রামের পথ ছিল নিত্যসঙ্গী সে পথই ভুলতে বসেছি। একা পথ চলছি এবং ভাবছি, এ পথেই তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তারপর অনেক পথ পাড়ি দিলাম। দুজনের পথ দুদিকে চলে গেল।

ছুটিতে বাড়ি এসে কে কেমন আছে খোজ খবর নেয়া, সাক্ষাতে দেখা করা এটা আমার পুরনো অভ্যাস। মা-ই বললো হ্যা রে খোকা, খবর শুনেছিস! শিউলির স্বামীটা মরে গেছে। আহা রে, হতভাগী মেয়ে! তার কপালটাই পোড়া। তিন তিনটি বাচ্চা...।

আমি বিদ্যুতের শক খেলাম। কোনো কথা না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। কেন জানি বেদনায় মনটা বিষিয়ে উঠলো। তাই হাটতে হাটতে শিউলিদের বাড়িতেই যাচ্ছি। ইতিমধ্যে তাদের পুকুরপাড়েই দেখা

মিললো, জীর্ণশীর্ণ শরীর, রঙিন কাপড় হলেও তা মলিন। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, সে সদ্য বিধবা হয়েছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে। চেহারায় লাবণ্য হারিয়েছে। চুলের সে বাহার আর নেই।

আমি সামনে যেতেই ঠায় দাড়িয়ে পড়লো। অপরাধীর মতো দাড়িয়ে আছে।

কেমন আছো, এ কথাটি জিজ্ঞাসা করে তার দুঃখটা বাড়াতে চেষ্টা করলাম না। সেই জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, ভালো!

প্রায় সাত বছর পর দেখা, কিশোরী বয়সে দেখা, তারপর যুবতী বয়সে বিয়ে। এখন সে পূর্ণাঙ্গ নারীতে পরিণত। মাথা নিচু করে সামনেই দাড়িয়ে আছে। হয়তো কাদতে কাদতে চোখের পানি শুকিয়ে ফেলেছে। তাই আর কাদতে পারছে না।

বললাম, বাচ্চারা কোথায়।

সে বললো, তাদের দাদা-দাদিরা নিয়ে গেছে। চলো বাড়ির ভেতরে বসে কথা বলবো।

বললাম, না থাক, এখন আর বসে কি লাভ!

শিউলি যেন জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কবে এলে?

সকালে বাড়ি পৌছালাম।

তুমি বিয়ে করলে না কেন? শিউলি প্রশ্ন করলো।

আমি একটু আক্ষেপ ভরা হাসি দিয়ে বললাম, নয়টার ট্রেন ছয়টায় ছেড়ে গেছে।

এভাবে কি জীবন চলে?

বললাম, চলে না ঠিকই তবে অনেক পথ চলে এসেছি। সামান্য পথ, এটুকু চলতে সমস্যা হবে না। তোমার কথা বলো?

শিউলি কোনো কথা বলা শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামতে চাই না। সেই ছোটবেলা থেকেই তার অভ্যাস। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি এবং হ্যা, হু, ইশ, তারপর এমনই শব্দ উচ্চারণ করছি। সে বলা শুরু করলো।

তোমার কথা বলার পর আব্বা প্রচণ্ড রেগে গেলেন এবং আমার কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তখন তুমি নতুন চাকরিতে সবেমাত্র বিদেশে গিয়েছো। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো এমন সময়ও নেই, ব্যবস্থাও নেই। নিরুপায় হয়ে পলিকে বললাম। পলি প্রচণ্ড ভীতু। কাজ হলো না। এদিকে বড় ভাই, আব্বা, আত্মীয়স্বজন সবাই মিলে ছেলে দেখা শুরু করে দিয়েছে। মা সব সময় চোখে চোখে রাখেন কিছু করে ফেলি কি না। আমি হলাম গৃহবন্দী। বদ্ধ খাচায় শুধু ডুকরে কাদা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। অবশেষে তাদের বশ্যতা স্বীকার করলাম। পাত্রের বাবা-মা থাকেন আমেরিকাতে। পাত্রও আমেরিকান হওয়ার প্রচেষ্টায়। বাবা-মা, ভাই-বোন লোভ সামলাতে পারলেন না। আমার অসহায়ত্বের কাছে নতি স্বীকার করলাম। ছেলের সমস্ত দোষত্রুটি ঢেকে গেল আমেরিকান লেবাসের কারণে। অথচ ছেলে বেকার। তাতেও তারা পাত্র হারাতে রাজি না। তোমাকে জানাবো এমন সাহস পেলাম না। নতুন চাকরি পেয়েছো। যদি চাকরি ছেড়ে চলে আসো সেই ভয়। নিজেকে সপে দিলাম নিয়তির কাছে।

কিছুক্ষণের জন্য শিউলি থেমে গেল।

বললাম, তারপর!

তারপর বেশ ধুমধামের সঙ্গেই বিয়ে হলো। শ্বশুরবাড়ি গেলাম। শ্বশুর-শাশুড়ি কেউ নেই। ছেলে শুধু একা। ছেলের চাচা-চাচি ও চাচাতো ভাইবোন। বাসর রাত সব মেয়েদেরই একটি সুখের রাত। কপালে কি ছিল জানি না। অনেক রাতে স্বামী প্রবরটিকে পেলাম মদ্যপ অবস্থায়। তখন করার কিছুই নেই। আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে

চুরমার হয়ে গেল। জৈবিক চাহিদা মেটালো আমার মনের বিরুদ্ধে। কিছুই বুঝতে দিলাম না কাউকে। এভাবেই সংসার জীবন শুরু করলাম। স্বামীর নিজের কোনো আয়-রোজগার নেই। বাবা-মায়ের দেয়া ব্যাংক ব্যালান্স দিয়ে মাতব্বরি করা। সারা দিন স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত এবং আড্ডায় মেতে থাকা। অনেক রাতে বাসায় ফিরে আমাকে ধর্ষণ করা। এই তার কাজ। প্রেম, ভালোবাসা কি হয়তো বোঝেই না। আমার দেহটা একটা কাগজে সই করে নিয়ে নিয়েছে। সে দুটো মিষ্টি কথা বলতে পারে না। দেহ ছাড়া কিছুই বোঝে না। আমার বাবা-মা খুব বেচে গেলেন সুখের নিখুত অভিনয় দেখে। বানিয়ে বানিয়ে সুখের গল্প বলি, মা-বাবা মহাখুশি। অথচ আমি পুড়ে মরি। মাস ছয় যেতে না যেতেই আমার দেহের মধ্যে একটি মাংস পিণ্ডের অস্তিত্ব অনুভব করি। ভাবলাম এবার হয়তো সুমতি হবে। সে তাতে খুশি হলো না, বরং বেজারই হলো। শেষে ছেলেমেয়ের ঝামেলায় অতিষ্ঠ হয়। খোদার অশেষ কৃপায় ছেলে জন্ম গ্রহণ করলো। ভাবলাম ছেলে হয়েছে, হয়তো খুশিই হবে। এবং খুশি হলোও। নাম রাখলাম এরিন।

বললাম, এরিন রাখলে কেন?

তোমার তো ইচ্ছা তা-ই ছিল। তুমিই তো বলেছিলে, ছেলে হলে নাম রাখবো এরিন। আমি ভালোবাসার স্মৃতি স্বরূপ এরিন নাম রাখলাম। এরিন বড় হতে লাগলো। আমি অবহেলিত হতে লাগলাম। আমাদের কালো গাভিটাকে দুধ পাওয়ার জন্য যেমন বাবা-মা এটা-ওটা খাওয়ায় এবং গর্ভবতী হলে যেমন খুশি হয়। স্বামী প্রবরটিও আমার দেহ পাবার জন্য দুই মুঠো ডাল-ভাত খাওয়ায়, ভালোবাসা দেয় না। এরিনের বয়স এক বছর না হতেই আবার গর্ভবতী হলাম। আমার বাবা-মা কেমন যেন সুখ সুখ অনুভব করেন। মনে হলো বড় বাচা বেচে গেছেন। শাড়ি কাপড় বলতে আটপৌরে যা দেয়। শখ করে নতুন ফ্যাশনের শাড়ি কেনার ইচ্ছা কখনো পূরণ হবে না বলে মনে আনেনি। পর পর দুই সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে আমার শরীর ঝনঝনে ট্রাকের মতো লক্কড়-ঝক্কড় হয়ে গেছে। তাতেও আমি ভেঙে পড়িনি। দুটি সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত কষ্ট ভুলে গেলাম।

স্বামীর আর আমেরিকা যাওয়া হলো না। স্থানীয় রাজনীতিতে সরাসরি সক্রিয় হয়ে উঠলো। আমাকে সময় দিল খুব কম। এই জরাজীর্ণ দেহের প্রতি লোভ কমে গেল। অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে পড়লো। আমার রূপ লাবণ্য মলিন হলো। আমাদের প্রচণ্ড ক্ষিধে পেলে যেমনি হাতের কাছে যা পায় তা নিয়ে চিবুতে থাকি তেমনি যখন কোনো নারী পেতো না তখন আমার এই জরাজীর্ণ ঘুণে ধরা কাঠ দেহখানিকে ধর্ষণ করতো। এই ধর্ষণের কারণে আমি তৃতীয়বারের মতো মা হলাম।

বললাম, ও হ্যা, ভালো কথা, তোমার দ্বিতীয় সন্তান অর্থাৎ মেয়ের কি নাম যেন রাখলে?

জেরিন।

বাহ! বেশ মিলিয়ে নাম রেখেছো তো?

হ্যা, তোমার ভালোবাসার স্মৃতির সাক্ষী স্বরূপ আমার ভালোবাসার ফসলের, তোমার পছন্দের নাম রাখলাম এবং তৃতীয় সন্তান ছেলের নাম রাখলাম মেরিন।

একদিন রাতে হঠাৎ পুলিশ এলো। আমাদের সমস্ত বাড়ি ঘিরে ফেললো। আমি ভয়ে তিন সন্তানকে জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগলাম। পুলিশ হ্যান্ডকাফ পরিয়ে তাকে নিয়ে গেল। সে ছিল সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী। যা হওয়ার তা-ই হলো। সে হলো কারাবন্দী। আমি হলাম অসহায়। কি করবো তিন সন্তান নিয়ে। শ্বশুর-শাশুড়িকে জানালাম। তারা কিভাবে ছেলেকে জেল থেকে বাচানো যায় তাই নিয়ে ব্যস্ত। অথচ আমরা চার চারটি প্রাণী অসহায় জীবন যাপন করছি। সেদিকে খেয়াল নেই। চলে এলাম বাবা-মায়ের বাড়িতে। বাবা-মা বেজার হলো কি না বুঝতে পারলাম না। তবে আশ্রয় পেলাম। প্রায় মাস ছয়েক বাড়িতে থাকলাম।

একদিন সংবাদ পেলাম স্বামীদেব জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। সন্তানসহ ছুটে গেলাম তাকে দেখার জন্য। কাছে পাবার জন্য। স্বামী আমার বড্ড রোগা হয়ে গেছে। কিছুই খায় না। কেমন যেন শুকনো শুকনো ভাব। ডাক্তার দেখালাম। মেডিকাল চেকআপ করাতে বললো। তাই করলাম। কিছু দিন পর মেডিকাল রিপোর্ট পেলাম। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য মেনে নিতে হলো। শরীরে পচন ধরেছে। অত্যধিক মদ পানের জন্য এমনটি ঘটেছে। ডাক্তার বলেছে, খুব তাড়াতাড়ি বিদেশে উন্নত চিকিৎসা না করালে রোগী বাচানো সম্ভব না। আমার কান্না ছাড়া কোনো উপায় নেই। কি করবো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। একবার স্বামীর দিকে তাকাচ্ছি আরেকবার তিন সন্তানের দিকে।

শ্বশুর-শাশুড়িকে আবার ফোনে জানালাম। বিস্তারিত সবই বললাম। ছেলেকে আমেরিকা নেয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে বললেন।

চাচাশ্বশুর ও অন্যরা বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

এদিকে স্বামীর অবস্থা আরো খারাপ। চোখ মুখ কোঠরে গেছে। পেট ফুলে গেছে। ফুসফুসে পানি জমেছে। খাওয়া-দাওয়া নেই। স্যালাইন দিয়ে বাচিয়ে রাখা হয়েছে।

এ কথাগুলো বলার পর শিউলি আর বলতে পারলো না। থেমে গেল। চোখ আচল দিয়ে বারকয়েক মুছে নিল।

বললাম, তারপর?

তারপর আমি সারাক্ষণ শংকায় থাকি কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে যায় সেই অপেক্ষায়। এদিকে ছেলে মেয়ের লেখাপড়া চুলোয় উঠেছে। আমার শরীর খারাপ থেকে আরো খারাপ হলো। একদিন দেখলাম স্বামী দেবতাটি আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাবলাম হয়তো ভালো হয়ে উঠছে। আমি তাকাতেই চোখের কোণে পানি চিকচিক করে উঠলো। হাত দিয়ে মুছিয়ে দিলাম।

এই প্রথম তাকে কাদতে দেখলাম। আমি সহ্য করতে পারলাম না। ডাক্তার প্রতিদিন এসে দেখে যায়। বললো, মনে হচ্ছে তো ভালোর দিকে যাচ্ছে। রাতে তাকে খাইয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম এবং আমি পাশে শুয়ে আছি। তখন খুব রাত হয়নি। আমার ঘুমও হয়নি। সে যেন আবার কেমন করছে। দ্রুত আমার বাবা শ্বশুর-শাশুড়িকে ডাকলাম। তখনো বেচে আছে। আমার কোলে মাথা রেখে হাত, পা টিপে দিচ্ছি। ততোক্ষণে সে আর নেই... বলেই শিউলি হাউমাউ করে কাদতে লাগলো।

নীরবে দাড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর কান্না থামলো। বললাম, শিউলি, বাকি জীবনটা কি এভাবেই কাটাবে?

সে বললো, তুমি পারলে আমি পারবো না কেন!

তোমার জন্য আমার দুয়ার খোলা সারা জীবন। যখন খুশি আসতে পারো, অপেক্ষায় থাকবো।

তা হয় না।

শিউলি আর দাড়াতে চাইলো না। ভোরে ফোটা শিউলি যেমন সকাল হতে না হতেই ঝরে পড়বে কোনো একদিন, কারো গলার মালা হয়তো হবে না, শত পথিকের পদে পিষ্ট হবে।

শিউলি চলে যেতে উদ্যত, আমি বাধা দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, এ জল শুকিয়ে ফেলে নতুন করে ঘর বেধো।

সে চলে গেল।

আমি তাকিয়ে রইলাম তার চলে যাওয়া পথের দিকে।

দত্তনগর, ঝিনাইদহ থেকে

স্যার

- কল্পনা বীথি

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। তখন সবে বয়ঃসন্ধিকালে পৌছেছি। বয়সটা খুব একটা বেশি না হলেও পার্থিব লোকের আবেগিক বিষয়ে অনেকটাই পরিপক্ক ছিলাম। ছোট, কোমল হৃদয়ের ভালোলাগা–ভালোবাসা বিষয়ে যথেষ্ট বুঝতে শিখেছি।

এরই মাঝে আমার স্কুলের পরিমণ্ডলে এক নতুন ধ্রুবতারার আবির্ভাব ঘটলো। তিনি আর কেউ না, আমাদের নতুন *স্যার*। মিতভাষী, দীর্ঘদেহী, সদালাপী, হাস্যোজ্জ্বল মুখাবয়ব সমৃদ্ধ সেই স্যারের চাহনি ছিল মন মাতানো। এক কথায়, তিনি যেমন স্মার্ট–হ্যান্ডসাম ছিলেন তেমনি ছিলেন সুপুরুষ। তাই আপন মনের নিভৃতে স্যারকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করলাম।

এভাবে দিন গড়াতে লাগলো। যতোই দিন গড়াতে থাকে ততোই স্যারের চিত্তে লয় হতে থাকি। আমার কোমল প্রাণের চাওয়া পাওয়া স্যারকে নিয়ে দানা বাসা বাধতে শুরু করে।

সেই তরুণ ব্যাচেলর স্যারের মুখোমুখি হবার সাহস পেতাম না। স্যারকে কিছু বলার অদম্য স্পৃহা নিয়ে সামনে গেলে পরক্ষণেই চুপসে যেতাম।

অবশেষে একদিন আমার ছোট মনের ভালো লাগা আর ভালোবাসার সমস্ত শক্তি দিয়ে স্যারের মুখোমুখি হলাম। আমি আমার মনের কথাগুলো অকপটে জানালাম।

কিন্তু বিধি বাম! আমি যতোটা না আশাবাদী হলাম তারচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িকতার বৈষম্যে আহত হলাম। কারণ স্যার ছিল মুসলমান আর আমি ছিলাম হিন্দু। ধর্মীয় বৈষম্যে আমার স্বপ্নের সমাধি ঘটতে চললো। কিন্তু আমার গভীর গতিময় ভালোবাসা সামাজিক শত বৈষম্য এবং প্রতিবন্ধকতাকে ডিঙিয়ে যে কোনো দামে স্যারকে পাবার মানসে উদগ্রীব হতে লাগলো।

সহজভাবে কাজ হবে না ভেবে কূটকৌশলের আশ্রয় নিলাম। স্যারকে ভয় দেখিয়ে আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে একটা চিরকুট লিখলাম।

স্যার আমাকে ডেকে অনেক কিছু বুঝিয়ে– সুঝিয়ে, পরামর্শ দিয়ে হাতে ছোট একটি চিরকুট ভরে দিয়ে চলে গেলেন।

তাতে লেখা ছিল, *আত্মহত্যা করেই যদি সকল সমস্যার সমাধান হতো তবে যেকোনো সমস্যায় পড়লে মানুষ কেবল আত্মহত্যা করেই তারা সমাধান করতো। তখন এই পৃথিবীতে বেচে থাকার মতো মানুষ খুজে পাওয়া যেতো না। তুমি সত্যিই যদি আমাকে ভালোবাসো তবে আত্মহত্যা করবে না। আত্মহত্যা করতে পারো না।*

হ্যা আমি আত্মহত্যা করতে পারিনি। তবে আমার বাড়াবাড়িতে যে বিপত্তি ও অশালীন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে স্যারের আর সেই স্কুলে থাকা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আমি জানি, স্যার যাযাদি–র একজন ভক্ত পাঠক ও লেখক। তিনি যদি এই সংখ্যাটি পড়েন এবং আমার লেখাটি যদি তার দৃষ্টিগোচর হয় তবে অন্তত যায়যায়দিনের মাধ্যমে আমার জঘন্য আচরণের জন্য তার কাছে ক্ষমা (প্রার্থী হবো) চেয়ে নেবো। আমার ভালোবাসার টানে এতো কিছু করেছিলাম। কিন্তু এটা যে স্যারের জন্য এতো অকল্যাণ বয়ে আনবে তা কখনো চিন্তা করতে পারিনি।

এ সত্ত্বেও আজও স্যারকে ভুলতে পারি না। শয়নে–স্বপনে, চিন্তা–চেতনায়, অষ্ট প্রহরের ভাবনায় স্যারের অস্তিত্ব ছায়ার মতো আমার নিত্যসঙ্গী।

কারণ তিনি যে আমার প্রথম ভালোবাসা!

গঙ্গাপাড়া, পত্নীতলা থেকে

নির্যাতিতা

- নির্মল গোস্বামী

সবার জীবনে প্রেম আসে। আমার জীবনেও প্রেম এসেছিল। আমিও ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু আমার এ ভালোবাসার কোনো সামাজিক স্বীকৃতি নেই। হয়তো মিলবেও না কোনোদিন। আমি আজ ভালোবাসা দিবসে আমার নিষিদ্ধ ভালোবাসার কথা লিখবো।

দুই ভাইবোন এবং মা-বাবাসহ আমাদের ছোট সংসারের দিনগুলো সুখেই কাটছিল। এই সুখের সংসারে হঠাৎ করেই কেন জানি প্রকৃতি বাধ সাধলো। আমার স্নেহময়ী জননী ইহলোক ছাড়লেন। এরপর শুরু হলো বাবার বিয়ে করার পাগলামি। আমিসহ কাকারা বুঝালেন। কিন্তু না বাবা সবার মতামত উপেক্ষা করে বিয়ে করলেন আমার সমবয়সী এক বঙ্গ ললনাকে।

আমি তখন অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে অধ্যয়নরত। আমার সমবয়সী হলেও তাকে মা বলতে বাধ্য হলাম। বাবার বিয়ের পর বাড়ি যাওয়া কমিয়ে দিলাম।

এরপর এলো গ্রীষ্মকালীন ছুটি। ছুটিতে বাড়ি গেলাম। দীর্ঘ এক মাস সাত দিন ছুটি। সমবয়সী হওয়াতে প্রথম মা বলতে ইতস্তত বোধ করলেও পরে আমাদের মাঝে চমৎকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং বাবার অনুপস্থিতিতে তার নাম ধরেই ডাকতাম। আমরা মনের কথাগুলো খোলাখুলি প্রকাশ করতাম।

কিছু দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর লক্ষ্য করলাম ছোট মায়ের মনে বিষাদের ছায়া। তিনি প্রায় কাদতেন। ছোটমাকে কাদতে দেখে একদিন তার কাদার কারণ জানতে চাইলাম।

ছোটমা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাদতে কাদতে বললেন, বাবা তাকে প্রতি রাতেই মারধর করেন। সে আরো বললো তার সঙ্গে যে আমার নিবিড় সম্পর্ক এটা বাবা মোটেই পছন্দ করেন না।

একবার ভাবি, বাবার সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিন্ন করবো? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবি, আমার লেখাপড়ার খরচের যোগান দেবে কে? অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছোটমা এবং বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ব্যালান্স রাখার চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। এরপরই ঘটে গেল আমার জীবনে সমাজের চোখে কালো অন্ধকারের একটি দিন।

বাবা অফিসের কাজে ঢাকা গেলেন। আমি রাজশাহী আসার প্রস্তুতি নিচ্ছি। জুনের ২৮ তারিখ। দুপুরে খাওয়া সেরে ছোটমা এবং আমি খোশমেজাজে গল্প করছি। সে ঢুলুঢুলু ভাব নিয়ে আমার কোলে মাথা রাখলো। পরক্ষণেই আমার বুকে মুখ ঘষতে লাগলো। আমি তাকে ছাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেই সে আরো শক্তভাবে আমাকে তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইলো।

এদিকে ভয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমনি সময় আমার কাকাতো ভাই আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকলো এবং ঘটনায় হকচকিত হয়ে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লো।

পাড়ার সবাই জানলো।

বাবা ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরলে তাকেও জানানো হলো। আমার বাড়ি ফেরার পথ চিরতরের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

রাজশাহী আসার সময় ছোটমা আমাকে বললো, নির্মল, আমার বাবা মায়ের যৌতুক দেয়ার সামর্থ না থাকায় তোমার বৃদ্ধ বাবার কাছে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। আমার যে দেহমনের চাহিদা থাকতে পারে তা তোমার বাবার অর্থ বিত্তের কাছে পরাজিত।

এরপর কোনোদিনই আমার বাড়ি যাওয়া হয়নি। শুনেছি ছোটমায়ের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেছে। ভালোবাসা দিবস এলেই তাকে মনে পড়ে! এ কেমন ভালোবাসা?

রাজশাহী থেকে

রসায়ন

- আবদুর রহিম

শুনেছি ভালোবাসা নাকি রসায়ন বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব! বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তা সম্ভব মনে হয় এখনো নিজেই বুঝতে পারিনি। তবে হ্যা, ব্যকরণে দুর্বল আমি সন্ধি বিচ্ছেদও যে দুর্বল তা নিজেই টের পাই। এ অপূর্ণ সুন্দর শব্দটির বিচ্ছেদকরণ প্রকল্পে। পাঠক মাত্রই জানেন যে, এর সন্ধি বিচ্ছেদ উত্তর অর্থ যে একটি ভালোবাসা (ঘর) নয়। এখন এ বাসা কি মনের ভেতর সৃষ্টি কিছু। না অন্য কিছু তা নিজেরাই বিচার করে নেবেন।

মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে ভালোবাসা আসে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, আঙ্গিক ও সাজে মনে হয় তিনটি শব্দের অর্থ এক! বোঝার বয়স থেকে এ ভালোবাসা সৃষ্টি হয় কোনো খেলনার ওপর [শতকার সাতষট্টি ভাগ ধারণা (ব্যক্তিগত)] সেই খেলনাটি যেকোনো ধরনেরই হতে পারে। বিবেচনায় তখন পরিবারের আর্থিক অবস্থা থাকে না। কি আর করা? কচি মন।

এরপর আসে কৈশোর। এ বয়সে ভালোবাসা সৃষ্টি হতে পারে কোনা ব্যক্তির ওপর অথবা কোনো খেলার (Game) ওপর। হতে পারে তা যে কোনো ধরনের খেলা। তবে ব্যক্তিটি হবে বড় ধরনের কিছু। উদাহরণ স্বরূপ কোনো নায়ক (নিজেই পুংলিঙ্গ হলে), খেলোয়াড় [এক্ষেত্রে শতকরা পচাত্তর ভাগ প্রেক্ষিতে)] ইত্যাদি। তবে এ লিস্টে কোনো নেতা বা শিক্ষক টাইপের কিছু থাকে না। কেননা প্রচুর মাথা খাটিয়ে এ বয়সে খেলাধুলো করা সম্ভব হলে এ ধরনের জীবনমুখী কর্মপরিকল্পনার চেয়ে স্বপ্নের পৃথিবীর দ্বিতীয় স্তর গঠনই সম্ভব।

এবার সম্ভবত সবচেয়ে নাজুক স্তর, তারুণ্য। এ স্তরের ভালোবাসা সৃষ্টি হয় বিপরীত লিঙ্গের [শতকরা পচানব্বই ভাগ (সকলের)] প্রতি। এক্ষেত্রে কারো প্রকাশিত, কারো অপ্রকাশিত। প্রথমেই বলেছি, যেহেতু স্তরটি নাজুক এবং বরাবরই গুণীজনেরা বলে গেছেন Youth is the seedtime of life. তখন লিখতে, পড়তে ও শুনতে ক্লাসের মধ্যে ভালো লাগলেও মানতে আমাদের সকলেরই দেরি হয়। চোখ মুখে রঙিন স্বপ্নে বিভোর পৃথিবীর কোনো বাধাই তাদের সামনে বাধা হয়ে দাড়াতে পারে না (শতকরা একত্রিশ ভাগ)।

মোটামুটি উন্নত স্তর এবারেরটি। আগের স্তরে কিছু অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এবং নতুন কিছু অভিজ্ঞতার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জীবন তরী এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এ সময়ের ভালোবাসায় যুক্ত হয় নানান পদ। প্রথমেই পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষা [(চাকরি+অর্থ+ .... + মনের মানুষ)। শূন্যস্থানের বাকি অংশ পাঠকের জন্য শূন্য রাখা হলো]। এ আকাঙ্ক্ষা জয়ের প্রচেষ্টায় যারা জয়ী হবে তারা একটি ভালোবাসা ও ভালোবাসা পাবে (যদি ভাগ্য সহায় থাকে)। এরপর জীবন আপনার গতিতে চলে (সম্ভবত) সর্বশেষ স্তরে এসে পৌছাবে।

এ স্তরে এবং সর্বপ্রথম স্তরের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। প্রথম স্তরের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের কোনো ভাষা না থাকলেও এখানে তার কার্যকারিতা খুব একটা লক্ষণীয় নয়। কারণ স্বপ্ন ভঙ্গের সমস্ত রেকর্ড এ স্তরে এসেও পূর্ব রেকর্ড ভঙ্গ করবে [(শতকরা আশি ভাগ) আশপাশে চোখ বুলিয়ে দেখুন]। কারণ আগে স্বপ্ন ভঙ্গ হলে তার পূরণের সময় থাকলেও এখন (হয়ত!) সে সময় থাকবে না। কেন না গা, গতর, শরীর (আবারও মনে হয় একই অর্থ) তখন নিজ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং পূর্ববর্তী অযাচিত ভুল এর জন্য মন থেকে ভালোবাসা নামের মধুময় লফজটি (উর্দু শব্দ) চিরতরে মুছে যেতে পারে যেহেতু ওই স্তরে পৌছানো অনেক দূর নিজের জন্য]। মন-মেজাজ হবে খিটখিটে এবং এর মধ্যে হয়তো বা জীবনাবসান হতে পারে। অতএব শেষ।

উপরে উল্লিখিত সমীক্ষাটি পরিবেশ - পরিস্থিতি ও ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে পারে। তবুও শতকরা আশি ভাগ (নিশ্চিত) ক্ষেত্রে এ রকমই। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে স্বপ্ন (সঙ্গে ভঙ্গ), আশা- আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন ধাবিত হলেও এর জন্য চাই ভালোবাসা (ইঞ্জিন সচলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তেলের মতো) যা থাকবে সব সময়

পাশাপাশি। জীবন না থাকলে যেমন ভালোবাসা অসম্ভব তেমনি ভালোবাসা বিহীন জীবনও অর্থহীন। আসুন, সকল দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ভালোবাসাকে নিজের মতো করে ভালোবাসি।

ইউএই থেকে

rahim7335318@yahoo.com

উপেক্ষিত রক্তকরবী

- আমিন

ভালোবাসা কি? এর জবাব আমি জেনেও জানিনি। সত্য প্রেমের খোজে একজন তার সম্পূর্ণ জীবন পার করে দেয়, তবু পায় না। কিন্তু আমি পেয়েছিলাম। পেয়ে হারানোর বেদনা কি তা বুঝেছি। তবুও অসংখ্যের মাঝে এই তফাত যে, নিজ দোষে নিজের প্রেম খুইয়েছি।

ঘটনার সূত্রপাত আজ থেকে প্রায় তিন চার বছর আগে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে। জীবনে প্রথমবারের মতো কোনো বড় উৎসব কাছ থেকে দেখা। এক নিকট আত্মীয়ের বিয়ে ছিল সেটি। অন্য সবার মতো আমিও সুখের দোলায় মেতেছিলাম। যদিও জানতাম না স্বপ্নের রাজকুমারীকে সেখানেই পাবো।

তখন সময়টা ছিল জুলাই মাস। আমরা ছিলাম বরপক্ষ। বরের সব আনুষ্ঠানিকতা আমাদের বাসা থেকেই সম্পন্ন করা হচ্ছিল। যদিও তাকে দেখি এই সময়ের মাস তিনেক আগে, তাও আবছা আবছা, মনে ছিল না। প্রথম পূর্ণরূপে দেখলাম কনের গায়ে হলুদে। তখন কৈশোরে পা রেখেছি। গায়ে হলুদ পর্ব শেষে নীল লেহেঙ্গা পরে সে অসাধারণ নেচেছিল তা আজও ভুলতে পারিনি। অবশ্য সেদিনে কোনো কথা বলিনি তার সঙ্গে।

সে আমার চেয়ে এক ক্লাস সিনিয়র। এ কথা জানি বরপক্ষের হলুদের দিন। সে ছিল কনেপক্ষের একজন। জীবনে প্রথমবারের মতো শাড়ি পরেছিল কি না জানি না। তবে বেগুনি সে শাড়িতে সেদিন তাকে অপূর্ব লেগেছিল এ কথা বলতে পারি।

যখন কনেপক্ষের যাবার বেলা তখন সাহস করে তার সঙ্গে মিনিট পাচেক কথা বলি। হাস্যকর মনে হয়। তবুও আমার প্রথম কথাটি ছিল, *তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?*

পরদিন ছিল বিয়ের দিন। সারা রাত এটা–সেটা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাতে সেদিন আমার সেরা সাজ দেয়ারই চেষ্টা করেছিলাম। বিয়ের গেটে তার সঙ্গে আমার দেখা হলো। অনুষ্ঠানের এটা–সেটার ফাকে কথা বলেছিলাম যতোক্ষণ পারি। কি এক অজানা ভালো লাগায় মনটা ভরে উঠছিল ক্রমেই। এক ফাকে দুটি ছবি উঠিয়েছিলাম তার।

এখনো যত্ন করে রেখেছি। ফিরে আসার সময় এক গোছা লাল গোলাপ তার হাতে গুজে দিয়েছিলাম। এখনো সেগুলো সে রেখেছে কি? জানি না।

বৌভাতের দিনে তাকে দেখেছিলাম এক নতুন সাজে। সালোয়ার কামিজটির রঙ ভুলে গিয়েছি। কালো চশমা আর এক মাথা ভর্তি কোকড়ানো চুলের মাঝে নিষ্পাপ একটি মুখ, ব্যস। স্রষ্টার কাছে আর কিছুই চাওয়ার ছিল না আমার। অন্যের চোখে হয়তো সে ততোটা সুন্দরী নয়। কিন্তু আমার চোখে সে অন্য রকম এক সৌন্দর্য।

এরপর এখানে–সেখানে তার সাথে টুকটাক দেখা হয়েছিল। আমার সবটা মনে নেই। প্রায় এক বছর পর তার ফোন পেয়ে হতবাক হয়ে যাই সৃষ্টিকর্তাকে যে কতোবার ধন্যবাদ দিয়েছিলাম তার ইয়াত্তা নেই। একজন মানুষের কণ্ঠস্বর যে এতো মধুর, অসাধারণ হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

সে বলছিল আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম। আমার জীবনের ডায়রিতে লিখে রাখা একটি স্মরণীয় দিন ছিল সেটি।

সাহস করে একদিন ফোন করলাম।

আসসালামু আলাইকুম।

এই কথাটি শোনার জন্য মাঝে মধ্যে এখনো ফোন করি, সে জানে না।

নেশার মতো হয়ে গেল। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তার সাথে খুনসুটিতে মেতে উঠতাম। আগেই দুর্বল ছিলাম, ভালোবাসার বীজ কখন জানি বপন করা হয়ে গেছে।

সে বলতো, 1 4 3 অথবা I (5+5) = u এগুলোর মানে কি?

শুনতে চাইতো।

আমি বলতাম।

তখন না বুঝলেও এখন বুঝি হয়তো ভালোবাসার উদাত্ত আহ্বানই ছিল। কোনোদিন তাকে জিজ্ঞাসা করিনি।

আসল ঘটনা ঘটলো যখন বছর শেষে পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করলাম। অন্যের জন্য হয়তো ঈর্ষণীয়। কিন্তু আমার জন্য যথেষ্ট খারাপ।

বাসায় কারণ জিজ্ঞাসা করলো।

কথায় কথায় ফোন আলাপের ঘটনা বের হয়ে এলো।

আম্মা জিজ্ঞাসা করলেন, ফোন কি আমি করতাম, না সে?

জীবনের একটি বড় ভুল এখানেই করলাম। ভালোবাসতে গেলে মাথা পেতে সব কিছু নিতে হয়। আমি নিইনি। অপবাদের আগুনের মাঝে তাকে ঠেলে দিয়েছি। নিজের গা বাচানোর জন্য তাকে অপমানের পর অপমানিত করেছি। মুখ ফুটে একবারও বলেনি যে, ফোন আসলে আমিই করতাম।

রক্তকরবীর মতো উপেক্ষার জোরে আজ সে দূরে সরে গিয়েছে।

লেখালেখির অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই ছিল। বড় ভাইয়ের ম্যাগাজিন প্রকাশের সময় লেখা দিতে হলো দুটি কবিতা। জীবনের প্রথম কবিতাটি লিখতে গিয়ে তার কথা যে কতোবার মনে এসেছে তা আর না–ইবা লিখলাম। এক ডজন ভালোবাসার কবিতা এ হতভাগার কলম বেয়ে অবতরণ করেছে ধরিত্রীতে। প্রতিটিই তার নামে উৎসর্গ করেছি, করবো।

যখন আমার কাছে কিছুই বলার ছিল না তখন সে ছিল। এখন আমার বলার আছে অনেক। সে নেই। তাকে হারিয়েছি নিজের ভুলে।

আমাকে ক্ষমা করো। তোমাকে কতোটা ভালোবেসেছি তার কোনো তুলনা আমার দেয়ার নেই। বুঝেছো কি? জানি না, যদি বুঝে থাকো তবে আশা করি, খোদা তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন। সার্থক হবে আমার সাহিত্যের প্রতিটি সৃষ্টি।

শেষ করতে গিয়ে তোমায় বলতে চাই একটি কথা। মনে কি পড়ে, একবার জিজ্ঞাসা করেছিলে, যদি কখনো কাউকে প্রপোজ করো তবে কি বলবে?

জবাব দিয়েছিলাম, আজও দেবো, প্রত্যেক জনমে দেবো, যতোদিন বেচে থাকবো, বলে যাবো। যদি ধ্বংস হয়ে যায় এ পৃথিবী, হারিয়ে যাও তুমি কিংবা আমি। যদি তুমি আমার ভালো নাও বাসো, আমায় প্রত্যাখানও করো, তবুও আমি তোমায় ভালোবেসে যাবো, জীবন দিয়ে ভালোবেসে যাবো।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে
shoummo_eka@yahoo.com

ঈদ

- ফৌজিয়া তাবাসুম রিতা

রোজার মাস। ঈদের আর এক সপ্তাহ আছে। ববিকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে।

রোজার আগে বলে দিয়েছে, রোজাতে যাতে দেখা না করি।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। ছুটে গিয়েছি তাকে দেখার জন্য। গিয়ে দেখি ঘুমুচ্ছে।

আমাকে দেখে চোখ ছানাবড়া।

ব্যাচেলর বাসায় এক পাল বন্ধু নিয়ে ঘুমুচ্ছে। সঙ্গে তার বিয়াই আছে।

একটা রুমে সে আর আমি গল্প করছি। সে শুয়ে আছে। সারা রাত সবাই আড্ডা দিয়ে সেহেরি খেয়ে এখন ঘুমে কাতর। পাশে বসে আছি।

সে বলছে, আমার রোজাটা ভাঙতে এসেছো, না?

আমি কেন তোমার রোজা ভাঙতে যাবো?

নিষেধ করেছি এসো না। তারপরও কেন এলে?

আমার ইচ্ছা হয়েছে তাই। এ কথা বলে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। যে মুখি নিয়ে অফুরন্ত স্বপ্ন দেখি, ভালোবাসি সে মুখের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারি।

তাকে জড়িয়ে ধরি, আদার করি, কিস দিই। প্রচণ্ড আকর্ষণে মনে থাকেনি রোজা রেখেছি। এ সময় এসব করা পাপ।

রোজাটা তো ভেঙে দিলে।

কিস দিলে বুঝি রোজা ভেঙে যায়।

হ্যা।

অনেক দিনের তৃষ্ণার্ত ববি যখন জড়িয়ে ধরে, নিজের ভেতর অন্য রকম শিহরণ অনুভব করি। মাথায় চিন্তা আসছে, এ রকম করলে তো হবে না, পাশের রুমে তার বন্ধুরা ঘুমুচ্ছে।

আমার বুকে যখন হাত রেখেছে, আদরে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে আমায়, আমার হাত তার পুরুষাঙ্গে নিয়ে রেখেছে। শক্ত হয়ে আছে তার নিচেরটা। সে বলছে, হাত দিয়ে ফেলে দাও।

তাই করেছি।

ববি রান্নাঘরে গিয়ে ময়লা আবর্জনাগুলো পরিষ্কার করেছে। আমার সামনে এসে বলছে, রিতা, তোমার যে গুনাহ হবে।

হেসে বললাম, গুনাহ শুধু আমার একা হবে, তোমার হবে না।

এ সময় একটা কালো লম্বা ছেলে এসেছে।

কি রে আজম, কি খবর?

ভালো।

আজম তার বান্ধবীকে নিয়ে এসেছিল এ বাসায় ডেটিংয়ের জন্য। এতো লোকজন দেখে চলে গেছে।

মনে মনে ভাবি, গুনাহ তাহলে আমি একা করি না। আরো অনেকেই আছে গুনাহকারী। যারা এই পবিত্র মাসটাতেও নিরিবিলি ব্যাচেলর বাসা খোজে। মৌলবাদীরা শুনলে বলবে, হায়! দেশটা রসাতলে গেছে।

বাসা থেকে বের হয়ে গেছি। আমার অনেক কাজ। আড়ংয়ে যাবো। কেনাকাটা করবো। তারপর অফিসে যাবো।

আড়ংয়ে অনেক মানুষ। সবাই পাঞ্জাবি কিনছে। ববির গায়ের মাপ জানি না। আন্দাজ করে খুব সুন্দর ডিজাইন করা একটা কিনলাম। আড়ংয়ে তার বন্ধু আজমের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে সুন্দরী প্রেমিকা।

আজমভাই! কি কিনছেন?

পাঞ্জাবি?

সে কিনে দিচ্ছে বুঝি?

না।

দেখেন তো এটা কেমন হয়েছে?

খুব সুন্দর। তোমার চয়েস ভালো।

আপনার বন্ধুকে মানাবে তো?

হ্যা খুব মানাবে।

সঙ্গে আজমভাইয়ের সুন্দরী ডার্লিং দাড়িয়ে আছে। কথা না বুলুক, হাসি দিয়ে যে মানুষকে অভিবাদন জানানো যায় সে সৌজন্যে বোধটুকুও সে দেখায়নি। ভাবি, গড গিফটেড সৌন্দর্য নিয়ে অহংকার দেখাচ্ছে!

সে কথা খুব কম বলে। তুমি কিছু মনে করো না।

নাকি মনে করবো!

মার্কেট থেকে যখন বের হয়েছি তখন বেলা বারোটা। দৌড়ে অফিসে গিয়েছি।

তার বার্থডে। তার জন্য অনেক বড় একটা কেক অর্ডার দিয়েছি, সেই সঙ্গে ফুলের তোড়া। হাসানভাইকে সাড়ে চারটার দিকে আসতে বলেছি। কারণ এতো বড় কেক, ফুলের তোড়া একা নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। হাসানভাই ওর খুব ভালো বন্ধু।

তার বাসায় যখন গেছি, দেখি এক পাল বন্ধু। অনেক অপরিচিত বন্ধু আছে যাদেরকে চিনি না, কেমন যেন আনইজি ফিল করছিলাম।

সবাই বলছে, রিতা থাকো, ববি একটু পরেই চলে আসবে। ইফতার করে যাও।

থাকিনি, চলে আসছি।

কেকটার ওপর লেখা ছিল *হ্যাপি বার্থডে টু ববি*।

পরে শুনেছি সে কেক কেটেছিল। মোমবাতি নিভিয়েছিল। বন্ধুরা হাততালি দিয়ে বার্থডে পালন করেছে। শুনে ভালো লেগেছে খুব।

তার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর যেন কেমন হয়ে গিয়েছি। সে ছাড়া সব কিছুতে নিজেকে একা মনে হয়।

ঈদের পর দিন প্রেমিক-প্রেমিকারা খুব সুন্দর করে সেজেগুজে বের হয়। শুধু আমিই ঘরে বসে থাকি। সবার সঙ্গে ঈদ মোবারক করা হয় তার সঙ্গে হয় না। সে আসে ঈদের দুই দিন পরে। তখন আমরা দুজনে বাসি ঈদ মোবারক পালন করি। পা ছুয়ে ঈদের সালাম করি।

সে লজ্জায় তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নেয়।

হয়তো আমার প্রেমিক ভাবে না, আমি এতোটুকু সম্মান করবো!

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, এসো ঈদের কোলাকুলি করি।

আমি খুব হাসি। কারণ তার সঙ্গে কোলাকুলি মানে কি সেটা তো এতো দিনে ভালোই বুঝি।

পাঠকরা, এতোক্ষণ তো আপনারা পড়েছেন প্রেমের গল্প। এবার পড়ুন বিরহের গল্প।

আজ আড়াই বছর হতে চলছে তার সঙ্গে আমার কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। খুব বিশ্রী এবং নোংরাভাবে সম্পর্ক শেষ হয়েছে। জানি এক হাতে তালি বাজে না। দোষ আমারও ছিল, তারও ছিল। আমার সবচেয়ে বড় দোষ ছিল তাকে বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করা।

ববির তথাকথিত ভালো বন্ধুরা আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে। একটা মেয়েকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে ববি আর তার বন্ধুদের বিবেকে বাধেনি।

ঈদের দিনগুলো আমার কাছে পানসে মনে হয়। নতুন কাপড় পরি না। আব্বা-আম্মাকে সালাম করে বাসায় বসে থাকি। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। মনে মনে ভাবি, আমার আনন্দ, সে তো চলে গেছে অনেক আগে। এখন আর কেউ বলে না, এসো কোলাকুলি করি। যার জন্য আমি মৃত্যুর দুয়ারে গিয়েছি সেই মানুষটা আমার কাছে ঘৃণার পাত্র। যার জন্য জমে আছে অজস্র ঘৃণা, ক্ষোভ, রাগ, দুঃখ তার অভিশপ্ত জীবন কামনাই আমার প্রতি মুহূর্তের প্রার্থনা।

ববির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হওয়ার পর অগণিত ছেলের সঙ্গে মিশেছি। অনেকের সঙ্গেই আমার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে। কিন্তু সেসব সম্পর্কের পরিণতি শুধু শরীরে শরীর মেলানো। দুই তিন মিনিটের ক্ষিধে মেটানো। আমি কখনো এসব ক্ষেত্রে মনকে প্রশ্রয় দিইনি। কারণ ততোদিনে বুঝে গিয়েছি, নারীজাত হচ্ছে অভিশপ্ত জাত, ঘৃণিত জাত, রাস্তার নর্দমার মতো ভোগের পরে ছুড়ে ফেলে দেয়া। যৌবন শেষ হলে দুর দুর করে ঘর থেকে বের করে দেয়া।

অনেকেই হয়তো বলবেন, আরে, এতো তসলিমা নাসরিন!

পুরুষজাতটার দিকে আঙুল তুলে বলবো, থুথু ছিটিয়ে বলবো, রিতা রিতা, আমি রিতা। কেন তোরা আমাকে বিষ খেতে বাধ্য করেছিস। যেদিন আমাকে ডাক্তাররা পেট থেকে বিষ ওয়াশ করছিল সেদিন পুরুষজাতটার গায়ে থুথু ছিটিয়েছি।

চট্টগ্রাম থেকে

আমার টমটম আমার অপূর্ণতা

- মৌমিতা

মানুষের জীবন কেমন জানি না। তবে আমার জীবন অনেক অন্য রকম ...। হয়তো কষ্টে ভরপুর। কিন্তু ততোটাই আনন্দের, শান্তিপূর্ণ। কখনো অসহ্য রকম নিকৃষ্ট আবার কখনো তারচেয়েও অসহ্য রকম সুন্দর।

আজ এই প্রথম নিজের কথা, নিজের একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের কথা লিখতে বসেছি। আমার ভালোবাসার কষ্টের কথা, অপূর্ণতার কথা।

এসএসসি পরীক্ষার আগে আমার দোস্তের মাধ্যমে সেই মানুষটার সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় থেকে কথা। সবচেয়ে মজার কথা হলো, অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও আমার যখনই মন খারাপ হতো, কিভাবে যেন সেদিনই তার ফোন পেতাম। এ রকমই চললো দুই তিন মাস।

হঠাৎ পহেলা ফেব্রুয়ারি আমাকে অবাক করে দিয়ে বলে, সে নাকি ভালোবাসে আমাকে!

অবাক হলেও বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম ফাজলামি করছিল। ছেলেদের সঙ্গে মিশলেও আমার মাথায় কখনো প্রেম করার চিন্তা আসেনি। তাছাড়া ছেলেদের এদিক দিয়ে তেমন পছন্দও করতাম না।

এক মাস ধরে সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো, দোস্তও এনশিওর করলো।

ও খুব ভালো ছিল। ধীরে ধীরে ওর প্রতি আমার যে মানসিকতা চেঞ্জ হচ্ছিল তা বুঝতে পারছিলাম। এসএসসি পরীক্ষা শুরু হলো। এর মধ্যে হঠাৎ শুনি (হাস্যকর নাকি কি সেটা জানি না) সে আমাকে ভালোবাসে না। তার নাকি মনে হয়েছিল আমি তার প্রতি দুর্বল অথচ আমার মনে কখনো ওই ধরনের চিন্তাও আসেনি। আমার এসএসসি পরীক্ষা যাতে খারাপ না হয় সে জন্য সে ওটা বলেছিল। সে নাকি আমার ভালো করতে চায়।

ওই দিনের পর থেকে সে আমার জীবনে দুর্বিষহ কষ্ট ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। স্বপ্ন ভাঙার মতো কষ্টের আর কি কিছু আছে? সেই দিন থেকে স্বপ্ন দেখাও ছেড়ে দিয়েছি। সে ভালোবাসে না, আমার মন নিয়ে খেলেছে এটা জেনেও তাকে বলেছিলাম, ভালোবাসি। তবে কোনো উত্তর চাইনি, জানি হবে না।

দুই মাস পর তাকে প্রথম দেখি। যদিও সে আমাকে আগেই দেখেছিল।

সেও অনেক কষ্টে ছিল তার নিজের জীবন নিয়ে।

আমি চেয়েছি তার কষ্টগুলো দূর করতে, পেরেছিও হয়তো।

সে আমাকে ভালোবাসে না বা গেম খেলেছে আমাকে নিয়ে তাতে কি হয়েছে! আমি তো সত্য ছিলাম।

এরপর দেড় বছর, ওর নিজের কষ্ট শেয়ার করে করে এবং ওর দেয়া চরম অবহেলা, অবর্ণনীয় কষ্টগুলো এবং কিছু অপ্রত্যাশিত আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল।

এটা ঘটনা বলি, ... না, তার আগে বলে নিই মাঝে মধ্যে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ভাবতাম যোগাযোগ রাখবো না। কিন্তু যখনই কথা বন্ধ করতাম তখনই সে আমাকে কিভাবে যেন মানিয়ে নিতো।

এভাবেই চলছিল দিন কাল। চরম কষ্টময় দিনকাল।

এবার ঘটনাটা পহেলা বৈশাখে তাকে উইশ করবো বলে রাত বারোটায় বাসা থেকে বের হয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ফোন বুকে গিয়ে তাকে ফোন করলাম।

তার রুমমেট ধরলো, বললো, সে ঘুমাচ্ছে। একটু ওয়েট করো।

তখন ঠাণ্ডায় কাপছি।

ফোন ধরেছিল আধা ঘন্টা পর। এতো দেরি করেও ওর কোনো ভাবান্তর ছিল না।

উইশ করে রেখে দিলাম।

জীবনের প্রথম ভালোবাসা দিবসও কাটলো চোখের পানিতে।

কি যেন বলেছিল এ রকম আরো কতো কষ্ট যে দিয়েছে। আবার মাঝে মধ্যে ভালোবাসার ভানও করতো। সেটা ছিল আরো কষ্টের।

ওর আশপাশে সবাই ওর আচরণ দেখে বলতো, সেও ভালোবাসে আমাকে।

বুঝতাম সে বাসে না। মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসাও করতাম, কেন ভালো না বেসেও ভালোবাসার ভান করো তুমি? সে বলতো, ভালোবাসি না সেটা তো বলিনি। তবে তাকে যতোটা ভালোবাসতাম ততোটা বাসিনা।

কি হাস্যকর, তাই না? হঠাৎ নিজের প্রতি নিজেই কঠোর হলাম। ঠিক করলাম, ও যতো যাই বলুক, যোগাযোগ করবো না। আমি আর ফোন করিনি।

কিন্তু শত মানা করার পরও সে আমাকে ফোন করতো। বিশেষ করে ওই আপুর জন্য যখন তার খুব খারাপ লাগতো তখন ফোন করতো আমাকে।

মিসবিহেভ করতে বাধ্য হতাম।

তখন এইচএসসি দেবো। এই একটা মানুষের প্রতি ভালোবাসা চাপা দেয়ার জন্য, ভোলার জন্য কথা না বলে থাকার কষ্টটাকে ভোলার জন্য, নিজেকে আমূল চেঞ্জ করে ফেললাম। যে মেয়ে সারাক্ষণ হাসতো, লাফাতো, বন্ধুত্ব করতো সে হঠাৎ করেই চুপ হয়ে গেল। নিজের চেঞ্জ-এ নিজেই কষ্ট পাই। ভাবতাম, ভালোবাসা মানুষকে কতো চেঞ্জই না করে দেয়। আল্লাহর কাছে তখন একটাই প্রশ্ন করতাম, কেনো এমন করে? যে মানুষটার আমার ভালোবাসা পাবার যোগ্যতাই ছিল না তার কাছেই কেন ...?

দেড় বছর কথা হয়নি। আব্বু আম্মুর পোস্টিংয়ের কারণে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এলাম।

হঠাৎ করে আবার তার ফোন বেড়ে গেল। শুনলাম তার বিয়ে হবে। কথা হলো দীর্ঘ দেড় বছর পর।

বিয়েটা তার হয়নি। তবে সম্পর্কটা অনেক ভালো হলো আমাদের। অন্য রকম ভালো। তার আবেগ আপ্লুত কথায় আমার কিছু হতো না। পাথর হয়ে গিয়েছিলাম হয়তো।

একদিন হঠাৎ সে বলে, সেও ভালোবাসে আমাকে।

খুশিতে হয়তো চোখে পানি আসার কথা ছিল এতোদিনের ভালোবাসা পরিপূর্ণতা পেল এই ভেবে। কিন্তু তা হয়নি। কিছুই হয়নি। বরং বলেছি, বিশ্বাস হয়নি। সবচেয়ে বড় কষ্টের ব্যাপার, একদিকে সে আমাকে বলছে ভালোবাসি আবার অন্যদিকে আমাকে না জানিয়ে বিয়ের জন্য মেয়ে দেখছে। এতো কষ্ট সহ্য করার মতো ক্ষমতা তখন কিভাবে পেয়েছি জানি না।

এটা তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললো, তার সঙ্গে নাকি আমাকে তার মা বিয়ে দেবে না কারণ আমি দেখতে ভালো না।

খুব মজা পেয়েছিলাম এ কথা শুনে। হায়রে ভালোবাসা! চেহারার কাছে চার বছরের ভালোবাসাও হার মানে। সেটা ভেবে হেসেছিলাম। তাকে বললাম, তাহলে আর দরকার নেই।

যোগাযোগ রাখিনি।

কিন্তু সে আগের মতো এখনো ফোন করে আমাকে।

রিসিভ করি না। মাঝে মধ্যে হাসি পায়, কান্না পায় রাগও লাগে।

মার্চ ২০০৪-এ আমার ভালোবাসার চার বছর পূর্ণ হয়েছে। এখন মেডিকালে পড়ি। আমার ভালোবাসা অপূর্ণই রয়ে গেল। এখন আমি কিছুই ফিল করি না, কিছু ভাবিও না। স্বপ্ন দেখতেও ভুলে গেছি। জানি না কখনো কাউকে ভালোবাসতে পারবো কি না বা কেউ ভালোবাসবে কি না।

মাঝে মধ্যে নিজেকে খুব একা মনে হয়। মাঝে মধ্যে এতো খারাপ লাগে যে, ইচ্ছে করে এমন একটা জায়গায় চলে যাই যেখানে কোনো আবেগ, অনুভূতি থাকবে না। আবার মাঝে মধ্যে অপেক্ষা করি, কবে কেউ আমার সমস্ত কষ্ট, বিতৃষ্ণাগুলো, অবিশ্বাসগুলো দূর করে আমাকে আমার মতো ভালোবাসবে। আমি তার অপেক্ষায় আছি। জানি না কে সেই জন?

ধন্যবাদ টমটমকেও। আমি ওকে এ নামেই ডাকতাম। তোমার জন্য এটা লিখতে পেরেছি। তুমি কষ্ট না দিলে এটা পারতাম কিভাবে!

ঢাকা থেকে

eto-kosto-keno@hotmail.com

প্রতিদিন

- অরিত্র মাহবুব

প্রতিবছর ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস হিসাবে পালিত হয়। কিন্তু আমার ভালোবাসা দিবস বছরের তিনশ পয়ষট্টি দিন।

ঘুম থেকে জেগে প্রথম চোখ মেলে আমার সোনাবৌকে দেখবো। সোনাবৌ যেন স্বর্গ থেকে আসা অপ্সরী যে ভুল করে পৃথিবীতে এসেছে। মানুষ এতো সুন্দর হয়, ওকে না দেখলে বুঝতাম না।

ভালোবাসা দিবসে আমরা হারিয়ে যাই দূরে কোথাও। যেখানে সে আর আমি ছাড়া কেউ থাকে না। খোলা আকাশ তলে তার কোলে মাথা রেখে গল্প করা। সে আমার লম্বা নাক টেনে যখন আদর করে তখন দম বন্ধ করে রাখি যেন পৃথিবীটা এখানেই থেমে থাকে। ওর প্রত্যেকটি স্পর্শ আমার কেমন যেন অজানা ভালো লাগে।

একদিন পার্কে বেড়াতে যাবো দুজন দুজায়গা থেকে।

আমি আগে গিয়ে বসে আছি।

ও জানতো যতো দেরি হোক না কেন ও না এলে আমি ওখান থেকে উঠবো না।

অপেক্ষার ক্লান্তিতে *দ* হয়ে বসে আছি হাটুতে হাত রেখে মাথা গুজে। হঠাৎ শুনতে পাই, *হে স্বর্গীয় দেবতা, আমার আসিতে দেরি হইয়া যাওয়ায় আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমাকে তুমি ক্ষমা করিয়া ধন্য করো।*

যেন মন্দিরে গিয়ে পুণ্যার্থী ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

ওরও ভুল হয়। কিন্তু যখন ভুলটা ধরা পড়ে তখন এমনভাবে ক্ষমা চায়, তাতে আমার হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যায়। ওর এসব দুষ্টুমি আমার ভীষণ ভালো লাগে।

ও আমার পাশে আছে বলেই আমার পৃথিবীটা সুন্দর। প্রার্থনা করি, হে বিধাতা, ও ছাড়া যেন পৃথিবীতে আমার একটা দিনও থাকতে না হয়। তাই যদি হয় তবে তার আগে যেন আমার মরণ হয়। ওকে ছাড়া আমার জীবন চলার কথা ভাবতেই পারি না।

যদি আমার কোনো ভুল হয় বা ওর প্রতি ভুলেও অন্যায় করে ফেলি তাহলে ও মুখ ভার করে বসে থাকে না বা কেন অন্যায় করেছি তা নিয়ে চেচামেটিও করে না। কোনো সুন্দর মুহূর্তে আমাকে আদর করতে করতে বলে, এই শোনো, তোমার কি ওই কাজটা করা ঠিক হয়েছে।

তখন এতো ভালো লাগে যে, ওকে সালাম করি।

ও বলে আমার লম্বু দেবতা, এসব করে ভগবানের কাছে আমাকে ছোট করছো কেন!

তখন আরো ভালো লাগায় মন চায় ওকে গিলে খেয়ে ফেলি। মানুষ এতো ভালো হয় কি করে, আমার ভাবনায় আসে না।

ও আসলে সিনেমা বা উপন্যাসের নায়িকাদের মতো সর্বগুণে গুণান্বিত। আমার সব কিছু শুধু ওর জন্য। আমার সৌন্দর্য, ভালো লাগা, ভবিষ্যৎ উন্নতি সব। মনে হয় ওরও একই ভাবনা।

ও আমার জীবন, আমার ভালোবাসা, আমার বেচে থাকার অবলম্বন, ও আমার জীবন চলার পথ প্রদর্শক এবং পরামর্শদাতা।

ওর অভিমান হয় যখন তাড়াতাড়ি বাসায় আসতে চেয়ে না পারি বা বিশেষ দিনে বেড়াতে যেতে চেয়ে না পারি। তবে বুঝিয়ে বললে সহজেই অভিমান ভেঙে যায়। কারণ ও জানে, ওর প্রতি আমার ভালোবাসার গভীরতা।

বিশেষ দিনগুলোতে কাজের চাপে সময় দিতে না পারলে যদি বলি কোথাও গিয়ে ঘুরে এসো, মনটা ভালো লাগবে। সারা সপ্তাহ তো বাসায় থাকো।

ও বলে, না মশাই, তোমাকে ছেড়ে স্বর্গেও যেতে চাই না। তুমি ফ্ৰ হও, তারপর বেড়াতে যাবো।

বিশেষ দিনগুলোতে ওকে নিয়ে ঘুরতে পছন্দ করি। ওর জন্মদিনসহ সব বিশেষ দিনে ওকে গিফট দিতে আমার ভালো লাগে। ছুটির দিনে ওকে পূর্ণ সময় দিই এবং ওর কাজে সহযোগিতা করি। ওকে বলি, সারা সপ্তাহ আমার জন্য কষ্ট করো, আজ বিশ্রাম নাও। সংসারের কাজগুলো আমি করি।

কোনো কোনোদিন সুবোধ বালিকার মতো সব কথা মেনে নিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমায় বা টিভি দেখে।

সব কাজ শেষ করে বলি, ক্ষিধেয় পেট চো চো করছে, এসো লক্ষ্মীসোনা, দুজনে গোসলটা সেরে খেতে বসবো।

ও তখন আমাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়। আবার কোনো কোনোদিন দূরে দাড়িয়ে কাজ করা দেখে আর হাসে। এবং কাছে এসে বলে, আমার সোনা, তুমি সারা সপ্তাহ বাইরে পরিশ্রম করো. বরং তুমি গিয়ে বিশ্রাম নাও।

এ নিয়ে আমাদের মাঝে ঝগড়া শুরু হয়।

তারপর ও নিজেই মীমাংসা করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, কাজের কারণে বাইরে থাকো, রাতে ছাড়া তোমাকে কাছে পাই না। দুজনে মিলে কাজগুলো করি। আমাকে দূরে থাকতে বলো না, প্লিজ।

তখন আমি তরকারি রান্না করি, ও ভাত রান্না করে। আমি ঘর মুছি, ও ঘর গোছায়। আমি ওর শাড়ি ধুই, ও আমার শার্ট ধোয়। ও আমাকে গোসল করিয়ে দেয়, আমিও ওকে গোসল করিয়ে দিই, চুলে শ্যাম্পু করে দিই, ওর শরীর মুছিয়ে চুলে টাওয়েল প্যাচিয়ে দুজনে খেতে বসি। আমি ওকে খাইয়ে দিই, ও আমাকে খাইয়ে দেয়।

ওকে ড্রেসিং টেবিলে বসিয়ে ভালো করে মাথা মুছে, চুলে তেল দিয়ে আচড়িয়ে দিই।

তখন মাঝে মধ্যে ও উদার হয়ে যায়। বলে, আমাকে এতো ভালোবাসো, বিনিময়ে তোমাকে কতোটুকু ভালোবাসা, কতোটুকু সুখ দিতে পেরেছি। আমি তোমার ভালোবাসা পাবার যোগ্য নই।

তখন আমার খুব রাগ হয়, আমিই বা ওকে কতোটুকু ভালোবাসতে পেরেছি! সকালের রান্না ওকে একাই করতে হয়। কারণ তখন আমার অফিসের ব্যস্ততা থাকে। মাঝে মধ্যে বিকেলের নাস্তা আমি তৈরি করলেও রাতের রান্না ও আমাকে করতে দেয় না। অফিসে যাবার সময় যদি ভুলে ওকে চুমু না খাই তাহলে ওই দিনটা আমার ভালো যায় না, কিসের যেন একটা পিপাসা লেগে থাকে।

বিছানায় যখন ওর চেরী ফুল দুটো নিয়ে খেলা করি তখন ও আনন্দে শিহরিত হয় এবং বলে, আর পারছি না গো, আমাকে শান্ত করো। যখন ওর ভেতরে যাওয়া আসা করি তখন মিলন আনন্দে চিৎকার করে। আমাকে জোরে ওর সঙ্গে চেপে রাখে, যেন আমি সরে না যাই। কখনো আবেগে আমার পিঠে চিমটি কাটে। এক সময় দুজনে শান্ত হয়ে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে থাকি।

একদিন পিঠে চিমটি কেটে রক্ত বের করে ফেলেছিল। পরবর্তীকালে সেই রক্ত দেখে ও যেন দিশাহারা। উৎকণ্ঠা নিয়ে বলে, একি, তোমার পিঠে রক্ত এলো কোথা থেকে! কেমন করে হলো! দেখে শুনে চলতে পারো না।

বলি, তুমিই তো করেছো।

ও আশ্চর্য হয়ে বলে, আমি করেছি কখন?

বলি, এখন আর মনে থাকবে কেন? যখন আবেগে জড়িয়ে ধরছিলে।

ও অনুশোচনা করতে করতে বলে, সত্যিই আমার ভুল হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করো। আসলে ওই সময় আমার কিছুই খেয়াল থাকে না।

তখন ওর হাত ধরে টান দিয়ে আমার কোলে বসিয়ে গাল টেনে আদর করে বলি, সোনাবৌ, আমি কিছুই মনে করিনি, বরং খুশি হয়েছি। কারণ আমার সোনাবৌকে একটু তৃপ্তি দিতে পেরেছি।

ও ধমকের সুরে আমাকে বলে, অসভ্যের মতো কথা বলো না। তোমাকে রক্তাক্ত করে আমার তৃপ্তির দরকার নেই।

ওকে আরো নিবিড় করে কাছে নিয়ে কানে কানে ফিশ ফিশ করে বলি, আমার দরকার আছে।

ও লাজুক হেসে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে ভেংচি কাটে।

রাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবে, না হলে ওর ঘুম হবে না।

ওকে কি বলবো, আমারও ঘুম হয় না।

ঘুমের মাঝে ওর বালিশটাকে দূরে ফেলে দিয়ে আমার বুকে মাথা রেখে গলা জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো ঘুমায় তখন কি যে ভালো লাগে!

অনেক দিন এমন হয়েছে যে, ওর ওই নিষ্পাপ মুখটা দেখতে দেখতে বাকি রাতটা কেটে গেছে, ভালো লাগায় আর ঘুমাতে পারিনি। মাঝে মধ্যে এমনো হয়, ওর ঘুম ভঙে গেছে। আমি ঘুমিয়ে আছি। তখন ও আমাকে চুমু খাবে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে বা পলকহীন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

একদিন আমি হালকা ঘুমে কপালে চুমু অনুভব করে জেগেও ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি। এক সময় ওর আদর করার ধরন দেখে আর হাসি চেপে রাখতে পারি না। হেসে চোখ খুলি।

ও তখন বলে, এতোক্ষণ তাহলে তুমি জেগেই ঘুমের ভান করেছিলে। বলি, হ্যা, তা না হলে তুমি তো আর এখন আমাকে আদর করতে না।

ও বলে, দুষ্টু কোথাকার।

আমাদের জীবনের প্রতিটি দিন ভালোবাসায় আচ্ছন্ন বিশেষ ভালোবাসা দিনের মতো। যদিও ভালোবাসা দিবসের এই লেখাটুকু আমার কল্পনা। জানি না, এমন দিন আমার জীবনে আসবে কি না।

মগবাজার, ঢাকা থেকে

স্বামী

- শাহনাজ পারভীন সুমা

বিবাহিত জীবনে স্বামী হচ্ছে নোঙ্গর। সে নোঙ্গর সংসারকে ভেসে যেতে দেয় না। কূলে দাড় করিয়ে রাখে, শত ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও আঘাতের মধ্যে। এটা আমার বাস্তব জীবনের উপলব্ধি এবং এটাও জেনেছি যে, দুঃখ, কষ্ট, রহস্য, রোমাঞ্চ একটা সংসারকে ঘিরেই তৈরি হয়। আর প্রত্যেকটি মানুষের জীবন আসলে একটা বহমান নদী। যে নদী বয়ে চলে তার নিজস্ব গতিতে।

শুধু সুখের মোড়কে আটা কোনো মানুষেরই জীবন নয়। তাই তো আছে ফুলের গন্ধ, সৌন্দর্য। আবার সে ফুলে রয়েছে কাটা। তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের সুখ আর দুঃখ দুই–ই আছে।

আমিও সামান্য মানবী। মাত্র আমার বেলায় কেনই বা এর ব্যতিক্রম হবে?

যখন ক্লাস টেনে লেখাপড়া করি তখন বয়স মাত্র পনেরো বছর। ঠিক তখনই খুব ঘটা করে আমাদের বিয়েটা হয়। আমার স্বামী ইমরান। ওকে খুব ছোট থেকেই দেখে আসছি যে, আমাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে সম্পর্ক খুব নিবিড়। সুখে–দুঃখে, আনন্দে–বেদনায় সবার পাশে থাকে।

ইমরানের ব্যক্তিত্ব, উদ্যম, কল্পনা, মুখরতা, জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, উদারতা, মহানুভবতা ও অকপটতা এসব দিয়েই সে যেকোনো মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখতো। তেমনি করে আমাদের পরিবারের সকলের মন জয় করে রেখেছিল।

আমিও ইমরানকে শ্রদ্ধা করতাম। তাছাড়া আমার স্বপ্ন ছিল ছোট্ট একটা গণ্ডির মধ্যে। স্কুলে যাওয়া–আসা, প্রাইভেট পড়া, লেখাপড়া করা। অন্য কিছু কি করে বুঝবো? কোনো প্রকার একটু ত্রুটি পেলেই কঠিন শাসন করে ছাড়ে। লেখাপড়ার প্রতি সে খুব নজর দেয়।

হঠাৎ–ই একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ইমরান সামনে এসে দাড়িয়ে বললো, সুমি, তোর সঙ্গে একটু কথা আছে, দাড়া।

আমি তো হতবাক! আমার সঙ্গে কথা আছে? তাও আবার এই রাস্তায় দাড়িয়ে? তখনই ইমরানের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করি ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। শরীর থেকে একটা বুনো ঘ্রাণ আসছে।

ইমরানের দিকে তাকাতে পারিনি সেদিন। ওকে কিছুটা অচেনা লাগছিল। চোখ সরিয়ে আনি। শুধু তার সংলাপগুলো নীরবে শুনেছিলাম। নিজেকে মনে হয়েছিল এক বিরাট দুর্বোধ্য নাটকের সামনে শুধু আমি একা বিমূঢ় দর্শক।

খুব দ্রুত ইমরানের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হয়ে গেলাম। জানতাম স্বামী হিসেবে যে পৌরুষত্ব থাকা দরকার তা ইমরানের মধ্যে আছে।

কিছুদিনের মধ্যে আমাদের বিয়েটা হয়ে গেল। সব মেয়ের জীবনে একটা রঙিন স্বপ্ন থাকে *বাসর।* আমারও ছিল। কিন্তু এই সমাজের আরো দশটি মেয়ের মতো বাসর আমার হয়নি। সে বাসর রাতে একটি বাক্য বিনিময় হয়নি দুজনের মধ্যে। কেননা সাজানো বাসর ঘর নয়, সামান্য একটা শাদামাটা রুমের মধ্যে স্বপ্নের সেই প্রতীক্ষিত রাত এলো। তবুও খুশি মনে অনেক আশা নিয়ে বাসর ঘরে গিয়েছিলাম। কিন্তু যাওয়ার সঙ্গেই যা ঘটে গেল তাতে বালুর বাধের মতো ভেঙে গেল আমার তিলে তিলে গড়া স্বপ্ন। আমার সর্বশরীরের কণাগুলো শীতল হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল বুকের মধ্যে একটা শির ছিড়ছে, কে যেন অস্তিত্বের শিকড় টেনে নিচ্ছে।

সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠামাত্রই আমার ছোট বোন আমাকে দেখে চমকে ওঠে। বলেছিল, এ কি চেহারা হয়েছে তোর!

কাউকে সেদিন কিছুই বলতে পারিনি, হয়তো কোনোদিনই পারবো না। সেদিন থেকেই বুকের বামপাশে ব্যথা অনুভব করলাম। মেনে নিলাম ভাগ্যকে। আর ভাগ্য মানলে প্রাপ্য মানতে হয়। প্রাপ্য মানলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

দুই তিন দিনের মধ্যে জড়তা কাটিয়ে ইমরানকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন আমাকে এভাবে ...।

উত্তরে বিনীত হয়ে ক্ষমা চেয়েছিল।

আমি ওকে ক্ষমা করে দিলাম।

শুরু হলো সংসার ও লেখাপড়া দুটো এক সঙ্গে।

সেদিন ইমরানের চেহারায় অনুতাপের আভাস আমাকে আহত করেছিল। দেখলাম একটা কাজ দিয়ে কোনো মানুষকে ভালো বা খারাপ নির্ণয় করা যায় না। ছোট্ট এই সংসারে ভালোবাসার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কিছুদিন যেতেই দারিদ্রের কষাঘাতে চরমভাবে হাপিয়ে উঠলাম।

এসএসসি পরীক্ষা দিয়েই ঢাকায় চলে এলাম দুজনে এক সঙ্গে। ইমরান মোটামুটি ভালো বেতনে একটা চাকরি পেল।

আবার নতুন করে ভালোবাসার স্বপ্নের নীড় বাধলাম দুজনে।

তার কিছুদিনের মধ্যে আমাদের মাঝে এলো এক নতুন অতিথি। তার নাম সেতু। তাকে ঘিরে আরো মুখরিত হলো জীবন। কিন্তু সুখ হলো তারার মতো, তারা যেমন সমস্ত আকাশকে ঢেকে রাখতে পারে না, মাঝে মধ্যে ফাকা থেকে যায় তেমনি সুখও কারো জীবনে দীর্ঘ স্থায়ী নয়। তাই তো দুঃখও পেয়েছি অনেক, আর্থিক, সামাজিক, সাংসারিক, পারিপার্শ্বিকের। তবুও জয় করতে হবে, যোগ্য করতে হবে নিজেকে। এটা দুশ্চিন্তা নয়, সংকল্প। জীবনে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্খলন, অপূর্ণতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব সামনে এসে দাড়ায় তবুও এই প্রতিজ্ঞাকে মুছে যেতে দেয়া যাবে না।

জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমাহার বুকে নিয়ে সংসারের সীমান্তে পৌছাতে পারিনি। কিন্তু সংসারে পৌছে এই কয়েকটি বছরে জেনেছি আত্মতুষ্টি ও আবেগ নিয়ে সংসারের অনেক কাজ ব্যাহত হয়। এবং জীবন, সময় ও সংসার মানুষকে কতো রকমভাবে ভাঙে-গড়ে জেনেছি নিজের জীবন দিয়ে। বুঝতে পেরেছি স্বার্থপর এ পৃথিবীতে কেউ কারো নয়, এমনকি রক্তের সম্পর্ক যতোই থাক, স্বার্থ ছাড়া কেউ কাউকে একটুও ভালোবাসে না।

ইমরানকে ভালোবাসি। ইমরান আমার জীবন। ভালোবাসার কথা কিভাবে বলতে হয় জানি না। শুধু জানি ভালোবাসি। ইমরানের ভালোবাসা আমাকে দিয়েছে পূর্ণতা, বেচে থাকার প্রেরণা। আমি ধন্য। ধন্যবাদ বিধাতাকে। ইমরান আমার জীবনে আছে বলে সাধারণ হয়েও আমি অসাধারণ।

সাভার, ঢাকা থেকে

লুটপাট

– শিমুল

তার চোখে যেদিন প্রথম তাকিয়েছিলাম তখন সে আমার দিকে তাকিয়েছিল। জানি না সে চাহনি কোনোদিন ভুলতে পারবো কি না? সে যে আমায় ভালোবেসে ফেলেছে তা তার মুখ থেকে না শুনলেও চোখের চাহনি দেখে বুঝতে পেরেছি।

তার চোখ দুটি যখন আমার দিকে থাকতো তখন একটা গানের কলি মনে পড়ে যেতো, *ওই চোখে তাকিও না, লুটপাট হয়ে যাবো।*

হয়েছিও তাই। সব কিছুতেই তাকে দেখি। প্রতিক্ষণে তার স্মৃতি আমাকে নাড়া দেয়। যদি এরই নাম ভালোবাসা হয়ে থাকে তবে বলবো, আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। যদিও তা কোনোদিনও হবার নয়, হবেও না তবুও না, পাওয়ার মাঝেই যে ভালোবাসার অন্য রকম সুখ তা আমাকে উপলব্ধি করতে হবে হাড়ে হাড়ে।

হাজীগঞ্জ, চাদপুর থেকে

চ্যানেল বদল

– ফাহিম

আদিবার ফোন নাম্বারটা পেয়েছিলাম আমার এক ফ্রেন্ডের মোবাইলের ফোন বুক থেকে। আগে থেকে ওর সম্পর্কে একটু–আধটু জানতাম। তাই একটু কৌতুহল ছিলই। শুনেছিলাম মেয়েটা অনেক ফ্র ভাবে অন্য ছেলেদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে।

বাসায় এসে রাতে শুয়ে শুয়ে ফোনের রিসিভারটা উঠালাম। ঠিক করলাম ওকে একটু টেস্ট করবো। তাই প্রথমেই আমার নিজের একটা বানানো নাম বলে তার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করার অফার দিলাম।

ফোন নাম্বার কোথায় পেলাম জানতে চাইলে বললাম, প্রিমিয়াম বাসের সিটের পেছনে নাম্বারটা লেখা ছিল।

সে আমাকে অবাক করে দিয়ে তার আসল নামটাই বললো। শুধু তাই না, তার বাসার নাম্বার দিয়ে দিল আর বললো, যেন বিকাল তিনটা থেকে পাচটার মধ্যে ফোন করি।

তারপর থেকে প্রতিদিনের রুটিন হয়ে গেল তার সঙ্গে কথা বলা। দুপুরের পর ইউনিভার্সিটির সব ক্লাস বাদ। দেড়টার পর পরই বারিধারা থেকে লালমাটিয়ার দিকে সোজা দৌড়।

কিছুদিন পরই বুঝতে পারলাম শুধু ফোনে কথা বলেই হচ্ছে না, তাই দেখা করার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলাম।

কিন্তু ও সবেমাত্র এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। বাসা থেকে একা বের হতে দেয় না। প্রাইভেট টিউশন থাকলে মা সঙ্গে যান।

একটা জিনিস খুব অবাক লাগতো, এতো রেসট্রিকটেড ফ্যামিলির হয়েও ও এতোটা এগ্রেসিভ মাইন্ডেড ছিল কিভাবে?

আদিবা মাঝে মাধ্যেই কোনো মুভির কোনো রোমান্টিক সিকোয়েন্স নিয়ে কথা বলতে আগ্রহ দেখাতো।

আমি শুধুই এগুলোকে ওর ছেলেমানুষি ভেবে উড়িয়ে দিতাম।

একদিন ওর ফোন এলো। কলেজের নবীনবরণ। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ফ্র। আমি যেন এগারোটার সময় কলেজের সামনের ফটোকপির দোকানের সামনে দাড়াই।

আমাকে আর পায় কে! ওকে নিয়ে রিকশায় উঠলাম। প্রথমে ধানমন্ডির আড়ংয়ের ক্যাফেতে ঢুকলাম। আগে থেকেই ভর্তি। তাই আবার নেমে রিকশায় উঠলাম।

এবার ইচ্ছা করেই হুড তুলে দিলাম যাতে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। হাতটা কোমরের পেছনে নিলাম।

দেখি আদিবার মধ্যে কোনো রিঅ্যাকশনই নেই। আমিই একটু লজ্জার মধ্যে পড়লাম। একটা মেয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা আর আমি কি না কি করছি। সরি বললাম ভয়ে ভয়ে।

অবাক করে দিয়ে উল্টো আমাকে বললো, রাস্তায় অনেক মানুষ কে কখন দেখে ফেলে, চলো তোমাদের বাসায় যাই। ওখানে বসে অনেক কথা বলা যাবে।

BFC থেকে লাঞ্চ কিনে নিয়ে বাসায় গেলাম। আমার বাবা মা দুজনেই চাকরি করেন আর আমি তাদের একমাত্র ছেলে।

বাসায় ঢুকলাম।

প্রথমেই সে বললো, আমি একটু ফ্রেশ হবো। বলেই বাথরুমে গেল।

বের হতেই দেখি গলা, কানের গহনা খুলে রেখেছে। সঙ্গে চশমাটাও টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছে।

চশমাসহ এবং চশমা ছাড়া আবিদাকে মেলাতে পারলাম না। এমনিতেই সে পাচ ফিট এক ইঞ্চি। আমার থেকে প্রায় নয় ইঞ্চি ছোট। তার উপর চশমা ছাড়া আরো ছোট লাগছিল।

বাথরুম থেকে বের হয়েই টাওয়েলটা আমার গলায় প্যাচিয়ে বললো, ফাহিম, একটা কথা বলবো, কাছে এসো। মুখটা নিচের দিকে ঝুকতেই আমার ঠোটের ভেতর নিজের গোলাপি ঠোট দুটো ভরে দিল।

কতোক্ষণ হবে জানি না। ঘোর কাটলো যখন শুনলাম কানের কাছে মুখটা এসে ফিশ ফিশ করে বললো, *আ'ই লাভ ইউ জান*।

ওকে কোলে করে আমার খাটে শুইয়ে দিলাম। ওর পাশে শুয়ে পড়লাম।

তারপর আধা ঘণ্টা আমি আকাশে। যখন মর্তে ফিরলাম, টের পেলাম আমার খোলা বুকের মধ্যে একটা গোল নাদুসনুদুস মেয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

মেয়েটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, আদিবা, সারা জীবন আমার বুকের মধ্যে এভাবে থাকবে?

কোনো রিপ্লাই এলো না। প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট পর মুখ খুললো। বললো, আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

শুনে হেসে ফেললাম।

বাইরে থেকে আনা খাবার এক সঙ্গে খেলাম। তারপর তাকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে এলাম। ওটাই তার সঙ্গে শেষ, প্রথম বা একমাত্র মিলন।

পরদিন আদিবার বাসায় ফোন করলাম। নিজে ফোন ধরেও আদিবা নেই বলে ফোন রেখে দিল। মোবাইলে ফোন করলাম, লাইন কেটে দিল। কলেজের সামনে দাড়ালাম। আমাকে দেখেই তাড়িতাড়ি গাড়িতে উঠে চলে গেল।

বাসায় এসে চিন্তা করতে বসলাম। আমার কোনো বাজে ব্যবহারে, নাকি আদিবার কনজারভেটিভ ফ্যামিলি আর ওর এগ্রেসিভ মাইন্ডের কারণেই এ ঘটনাটা ঘটেছে, নাকি প্রেম জিনিসটাই এমন!

ধুর! একটা মেয়েকে নিয়েই সারা জীবন চিন্তা করলে চলবে নাকি? জীবনে করার মতো আরো কতো কিছু আছে। কেবল লাইনে অনেক চ্যানেল থাকে। একটি চ্যানেল ভালো না লাগলে তা বদলে অন্য চ্যানেল দেখা যায়। কারণ Life is beautiful – লাইফ ইজ বিউটিফুল।

ঠিকানা বিহীন

লজ্জা

- রুমা

চুপচাপ দুজন মুখোমুখি বসে আছি। কারো মুখে কোনো কথা নেই। মৃদু স্বরে বেজে চলেছে আমার প্রিয় গানটি।

হঠাৎ ও বলে উঠলো, এমনভাবে বসে আছো যেন শিক্ষকের সামনে ছাত্রী বসে আছে।

আমি এবারও চুপ। আমার চিরাচরিত লাজুক হাসি হাসলাম। লজ্জায় আধমরা হয়ে কোনোমতে বসে আছি মাটির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এদিকে বুকের ভেতর তুমুল ঝড় যেন সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। লজ্জা পাবোই বা না কেন? আজ প্রথম তার মুখোমুখি হলাম রাজি হওয়ার পর। মনে মনে ভাবছি, কেন যে এই ঝামেলায় জড়াতে গেলাম! রাজি না হলে আজ এই লজ্জায় পড়তে হতো না।

রাজি না হয়ে কি আর উপায় ছিল! আমার মাথাটা তো সে অনেক আগেই খেয়ে বসে আছে। সেদিনের রাতটা ভোলার নয়। ১৫ জুলাই রাত আড়াইটা। আমাকে রাজি করানোর কি প্রচেষ্টা ওর! এসবই আধুনিক প্রযুক্তির

অন্যতম আশীর্বাদ মোবাইল ফোনের অবদান। মেসেজের মাধ্যমে তুমুল বাগবিতণ্ডার ফলস্বরূপ অবশেষে ওর জেদের কাছে পরাজিত হলাম।

জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটলো। পালটে গেল সব কিছুই। ও যেন আমাকে পৃথিবীর সকল রূপ-রসের সন্ধান দিল। জীবন এতো সুন্দর, এতো মধুর আগে বুঝিনি।

একটু সময়ের জন্য তাকে কাছে পাবার জন্যে এতো ব্যাকুলতা! ও পাশে থাকলে যেন সব ভুলে থাকা যায়। ঠিক তেমন ওর সঙ্গে ঝগড়া হলে যেন জীবনটাই থেমে যায়, সব নিথর হয়ে যায়। কেন যে, ওর সঙ্গে ঝগড়া করি! ওকে যেমন কষ্ট দিই, নিজে আরো বেশি কষ্ট পাই। এই কান ধরলাম, এর তোমার ওপর রাগ করবো না, জান।

আজও আমাদের সেই প্রথম দেখা করার দিনটির কথা ভাবলেই হাসি পায়। কি লজ্জাটাই না পেতাম তখন ওর সামনে যেতে। আর এখন সব লজ্জা যে কবে বিসর্জন দিয়েছি, তাই বুঝতেই পারলাম না। ওকে একা পেলে তো পারলে শার্ট টেনে ছিড়েই ফেলি। ওর বুকে মাথা রেখে গল্প করা আর মিষ্টি দুষ্টুমি এতো ভালো লাগে কেন জানি না।

জান গো, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবতী। আমি ধন্য তোমাকে পেয়ে, তোমার ভালোবাসা পেয়ে। আজ এই ভালোবাসা দিবসে তোমাকে জানাই অ-নে-ক ভালোবাসা আর...।

চান্দগাও, চট্টগ্রাম থেকে

বিষাক্ত

- কানিজ ফাতেমা রুমী

রূপককে ভালোবাসি সেই ছেলেবেলা থেকে। তখন হয়তো ভালোবাসার মানেটুকুও জানতাম না। তখন থেকে ওকে এতোটাই ভালোবাসতাম যে, কখন নিজের অস্তিত্বটাকে ওর মাঝে হারিয়ে ফেলেছি তা টেরও পাইনি। সে ভালোবাসা এমনই অন্ধ ছিল যে, সে আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভালোবেসেছি কি না তা ভাবারও অবকাশ পাইনি।

কিন্তু বরাবরই লক্ষ্য করেছি, সে আমাকে কারো সামনে পাত্তাই দিতে চায় না। এমনকি সামনাসামনি ধাক্কা খেলেও তাকিয়ে দেখে না। অথচ সবার অলক্ষ্যে এমন ভাব দেখায় যেন আমি ছাড়া ত্রিভুবনে তার কেউ নেই। তার সমস্ত আনন্দ-ব্যথার ভাগ আমাকে না দিলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ নিয়ে ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রশ্নই আমার মনে আসেনি যতোক্ষণ না ধাক্কা খেয়েছিলাম।

এমনিতে জানতাম ও বেশ অহংকারী, যশ পাগল ব্যক্তি, প্রচণ্ড লোকলজ্জা বিশিষ্ট আর সমাজ ভীরুও অত্যাধিক। কিন্তু আসলে যে ও কতো বড় কাপুরুষ তা কেবল আমর দুর্বলতার জন্যই চোখে পড়েনি।

আমি আহামরি তেমন সুন্দরী না হলেও কেন যে, আমার ওপর এতো পুরুষের লোলুপদৃষ্টি তার উত্তর খুজতে কতোবার নির্জনে আয়নায় নিজেকে দেখেছি! অথচ তাতে কোনো আবেদনই খুজে পাইনি। আমি খুব সেক্সি না হওয়া সত্ত্বেও পুরুষরা কেন যে আমাকে দেখে সেক্সি হয়ে ওঠে তার উত্তর খুজতে নিজেকেই অপরাধী করেছি যেন পরের মাল বিলিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ বিনা দলিলেই কখন যেন রূপকের সম্পত্তি হয়ে উঠেছি। তাই হয়তো রূপক যখন আমার প্রতি তৃষ্ণা জানাতো তাকে ভালোবাসায় ভেবেছি।

কিন্তু হঠাৎ সে যখন আমার ভালোবাসাকে অবিশ্বাস করে, তাল সামলাতে পারিনি। তখন মাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। সে ছিল আমার থেকে মাত্র দশ বছরের বড়। আর একেই সে দেখিয়েছিল বিরাট পার্থক্য বলে।

সে বলেছিল, তুমি যে কলেজের ছাত্রী তার টিচার আমার বান্ধবী। তোমাকে যদি বিয়ে করি তাহলে ওদের কাছে লজ্জা পাবো।

তাকে জানালাম যে, আমার পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর তো আর তা বেমানান থাকবে না।

সে বলেছিল, তা থাকবে না কিন্তু আমার বিয়ে করতে আরো দশ বছর। ততোদিন তোমার বাবা–মা মানবে না।

বলেছিলাম, সে দায়িত্ব আমার, পড়াশোনা শেষ হতে তো আরো সাত বছর।

কিন্তু তুমি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমার কথা তোমার মনেই থাকবে না।

অসম্ভব, আমার ভালোবাসা এতো ছোট নয়।

এসব তোমার আবেগ। বি প্র্যাকটিকাল। ভালোবাসা ধোয়ার মতো মিলিয়ে যাবে।

বিশ্বাস করি না।

আমিও তোমার ভালোবাসা বিশ্বাস করি না।

তখন গর্জন করে উঠি।

সে শান্ত স্বরে বলে, প্রমাণ দাও।

আমি বলি, কি চাও? আমি এই মুহূর্তে মরতে পারি।

সে মুচকি হেসে মাথা দুলিয়ে বলে, মরা সহজ, বিষাক্ত জীবনে বাচাটাই কঠিন। তুমি কি পারবে আমার দায় গ্রহণ করতে? তুমি কি পারবে নিজেকে এই মুহূর্তে আমার হাতে তুলে দিতে। তুমি কি পারবে ক্ষণিকের এই উপহারকে সমাজের মাঝে ধরে রাখতে?

পারবো, পারবো, পারবো। তোমার জন্য সব পারি। অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ি।

সে আমাকে শক্ত দুই হাতে বুকে তুলে নেয়। কপালে একে দেয় ওষ্ঠরেখা।

শিহরিত হই।

সে মুছিয়ে দেয় চোখের জল।

পুলকিত হই।

তার অধরে চেপে ধরে আমার ঠোট।

আমি তার মাঝে মিশে যাই।

সে আমার সমুদ্রের তলদেশ থেকে মুক্তো খুজে আনে।

আমার মাঝে ঢেউ ওঠে।

তারপর এক সময় সব একাকার এরপর নিস্তব্ধতা।

এক সময় তাকে জানালাম, আমি মা হতে চলেছি। ভেবেছিলাম হয়তো আমার পরীক্ষা শেষ, আমি উত্তীর্ণ। এখন সব দায়িত্ব তার। বরাবরই তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে এসেছি।

সে আমাকে অবাক করে জানালো, এই দায় বইবার দায়িত্ব শুধুই আমার।

অনাগত সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে হবে। সমাজে স্থান দিতে হবে। এতোদিন যে সমাজকে তুচ্ছ করেছি, আজ সে যেন প্রতিশোধ নিতে চায়।

সন্তানের চাই স্বীকৃতি, আমার চাই ছায়া।

ডাকলাম সুমনকে যে আমার নামে তার সমস্ত সম্পদ লিখে দিতে পারে। ডাকলাম, লিপু, রাফি, অর্ণব, কাঞ্চনকে যারা নাকি আমার হাসির বিনিময়ে স্বর্গ খোয়াতে পারে।

সবাই মাথা নিচু করে নিশব্দে চলে গেল। কেউ কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করলো, কেউ প্রয়োজন বোধ করলো না। রাফির মুখে শুনে ছুটে এলে রোহিত। আকুল প্রার্থনা করলো যেন তার ভালোবাসা কষ্ট না পায়। সে যে, আমাকে দিনের পর দিন এভাবে নিঃশব্দে এতোটা নিঃস্বার্থ ভালোবেসে এসেছিল তখনো জানতাম না। নিজেরই প্রয়োজনে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।

রোহিত আমাকে ছায়া দেয়, সন্তানের স্বীকৃতি দেয়। বিনোদন দেয়। আমাকে উচ্চশিক্ষা দেয়। চায় না কিছুই। আমার একার ছেলে বড় হয়েছে। রূপকের প্রিয় ছাত্র।

একদিন হঠাৎ গিয়ে রূপককে বলি, আমার সব দাবি মিটিয়েছি, আমাকে নেবে?

সে আমতা আমতা করে বলে, সে ঠিক। কিন্তু তুমি এখন রোহিতের স্ত্রী। ভোগ্য হয়ে গেছো। তোমাকে এখন গ্রহণ করলে লোকে বলবে, রোহিতের উচ্ছিষ্ট নিতে আজও বিয়ে করিনি।

তার মুখের সামনে আঙুল তুলে বলেছিলাম, যে রোহিত নিঃস্বার্থে তোমার দায় নিতে পেরেছে, তার সম্পর্কে সম্মান দিয়ে কথা বলবে।

অথচ তারই হাতে তুলে দিতে রোহিত আমাকে একটিবারও ছুয়ে দেখেনি।

সেদিন ফিরে এসে রোহিতকে আপন করে নিয়েছিলাম। রোহিত আমাকে না বলতে শেখেনি। তাই হয়তো একটু ভালোও বেসেছিলাম।

আজ আমাদের ছেলে অনেক বড়। রূপকের রূপ, আমার জেদ আর রোহিতের মন নিয়ে মানুষ।

আজও রোহিত আমাকে তেমনি ভালোবাসে। প্রতিটি ভালোবাসা দিবসে ফুলের মালা এনে দেয়। সে মালা হাতে নিয়ে আজও যে কেন মনের মাঝে রূপকের মুখ অসহায় ভঙ্গিতে ভেসে ওঠে তার উত্তর কখনো খুজে পাই না।

বাঘমারা, ময়মনসিংহ